দ্বিতীয় অধ্যায়

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/১৭৭৪—১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬) প্রমুখ বাঙালীর নিকট অবিস্মরণীয় নাম। বাঙালীর জাতীয় জীবন গঠনে এঁদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অধ্যায়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের বাংলা সাহিত্য বাঙালীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচনা করা হবে। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ বলতে ঠিক কোন্ সময়কে বোঝান হয়েছে, তা স্পষ্ট করা উচিত। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জীবিত কালসীমা অষ্টাদশ শতকের শেষসীমা (১৭৭২/১৭৭৪) থেকে উনিশ শতকের শেষসীমা (১৮৯১) পর্যন্ত। এভাবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জীবিত কালসীমাকে না ধরে বরং জাতির প্রয়োজনে এঁদের কর্মময় জীবনকেই গ্রহণ করা উচিত। এই পথে সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত কালসীমাকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য চর্চায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের রচনা বাঙালীর আত্মবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই কর্মময় সময়ে বাংলা সাহিত্যকে অস্ত্র করে জাতীয় জীবনের উন্নতিতে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশ্য এই অধ্যায়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বর গুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা করা হবে না। কেননা, তৃতীয় অধ্যায়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবি ঈশ্বরগুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

বণিক ইংরেজ জাতি পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭) নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলার কর্ণধার হয়। বিদেশী বণিকের এই সাফল্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ প্রমুখের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও এদেশের যুগচিন্তা নায়কগণ ইংরেজ শাসনের প্রবল সমর্থক ছিলেন। এর দু'টি কারণ নির্ণয় করা যায়। যথা,—নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, যা নবাব আমলে অনিশ্চয়তায় ভরা ছিল এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত ভয়ঙ্কর পঙ্কে নিমজ্জিত বাঙালীর মুক্তির উপায় নেই। যদি পাশ্চাত্য জাতির সহাবস্থানে থাকা যায়, তাহলে বাঙালীর দীর্ঘদিনের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ থাকে। প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা বলা যায়। তিনি লিখেছেন;—

"বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায়

প্রসিদ্ধ নেতা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ উদার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইংরেজদিগকে ভারতে পাঠাইয়া হিন্দুদিগকে নয় শত বর্ষব্যাপী মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।'' (১)

ভারতের প্রথম আধুনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি রামমোহন রায় বৃটিশের নিকট জাতীয় পরাধীনতাকে অভিশাপ মনে করেন নি। বরং সমকালের নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষালাভের সম্ভাবনা রামমোহন রায়কে ইংরেজ শাসনের সমর্থক করে তুলেছিল।

আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি — ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থ, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীর কোন গঠনমূলক চেতনা ছিল না। ফলে জাতীয় জীবনে চূড়ান্ত অবক্ষয় নেমে এসেছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় রামমোহনের মতো আত্মসচেতন বাঙালী বা হেয়ার সাহেবের মতো উদার ও মানবতাবাদী ব্যক্তির উদ্যোগে বাঙালীজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমশ সচেতনতা আসে। রামমোহন, ডেভিডহেয়ার প্রমুখ অনুভব করলেন — বাঙালীর মুক্তির জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন;—

''রামমোহন রায় কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অপরাপর অভাবের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব অতিশয় অনুভব করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় কলিকাতাতে আসিলেই ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুতা হইল। হেয়ার এদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন; এবং তাঁহার ঘড়ির দোকানে সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন।'' (২)

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক উদ্যোগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যথা;— ডিরোজিও-এর শিক্ষক ড্রমণ্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমী, ফর্বেশ সাহেবের চুঁচুড়ায় (১৮১৪) প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল, রবার্ট মে সাহেবের প্রায় ৩৬টি স্কুল, শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় শতাধিক স্কুল, হিন্দু কলেজ (১৮১৭), রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দু স্কুল (১৮২২) প্রভৃতি স্কুল সেকালে ইংরেজী শিক্ষা লাভের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য 'স্কুলবুক সোসাইটি' (১৮১৭) এবং বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বা গতিদান করেছিল।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার পর শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী সমকালের ঘূণেধরা সমাজব্যবস্থার সংস্কারে মনোযোগী হন। এঁদের মধ্যে ভবানীচরণ

202021
14 FEB 2008
NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঙালীর অবক্ষয় থেকে মুক্তির উপায় বলে মনে করেন। আবার ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় বা উগ্র আধুনিকপন্থীগণ দেশীয় আচার সংস্কৃতিকে জাতীয় অবনতির জন্য দায়ী করে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবল সমর্থক হয়ে উঠেন। কেউ কেউ দেশীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় অংশকে গ্রহণ করার মধ্যেই বাঙালীর জাতীয় জীবনের উন্নতির কথা বলেন। আমরা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সময়ে প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী ও প্রগতিপন্থী আদর্শের সন্ধান পাই। লক্ষ করা যাবে, এই তিন মতবাদের সমর্থক প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল কামনা করতেন। নব্যপন্থী সম্প্রদায় যতই স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি অস্বীকার করার কথা বলুক, তবুও স্বদেশের জন্য এঁদের অন্তরের বেদনার সন্ধান পাওয়া যায় । এঁরা দেশের চরম দুর্দিনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সন্ধান পেয়ে এদেশের বুকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে বইয়ে দিতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য জাতির মতো সমৃদ্ধজীবন কামনার আন্তরিক উদ্যোগকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। প্রসঙ্গত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রাণ-পুরুষ ডিরোজিওয়ের ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথা বলা যায়। 'সেকাল আর একাল' প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বসু ডিরোজিও-এর ভারতানুরাগের প্রসঙ্গে একটি আখ্যান কাব্যের 'মুখবন্ধ' মূলক কবিতার উল্লেখ করেন। যথা —

"My Country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast–
Where is that glory, Where that reverence now ?
Thy egale pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee.
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! one kind wish for thee." (৩)

এই মুখবন্ধ মূলক কবিতায় ডিরোজিও ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে বন্দনা করেছেন। সঙ্গে প্রাচীন ভারতের

ঐতিহ্যের প্রতি গৌরব ও সমকালের দুঃখিনী ভারতের জন্য বেদনা বোধ করেন। দেশমাতৃকার প্রতি ডিরোজিওয়ের এজাতীয় শ্রদ্ধা আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু জাতির উন্নতির লক্ষে ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গীয়দের উগ্র আধুনিক মতবাদ বা অনুকরণবাদ সফল হতে পারে নি। সেজন্য উগ্র আধুনিক মতবাদ বা অনুকরণবাদকে একটি পরীক্ষামূলক মতবাদ হিসাবে ধরা যায় ।

প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীলদের ভাবনাতেও দেশপ্রেম লক্ষ করা যায়। তবুও এঁদের চিন্তা চেতনা যুগধর্মের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। এঁরা শুধু প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরতে চান। প্রাচীন ঐতিহ্যকে এতখানি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিলেন যে, এঁদের নিরপেক্ষতা বোধ লোপ পেয়েছিল। যা কিছু দেশীয় তাকে রক্ষা করতে হবে। এরকম মানসিকতায় দেশের প্রতি একটি অন্ধ আসক্তি লক্ষ করা যায়। তবুও এই মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি বিপন্ন জাতির জীবনে সার্বিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। ফলে এই মতবাদ, উগ্র আধুনিক মতবাদ বা অনুকরণবাদের মত পরীক্ষামূলক অর্ধসত্য মতবাদ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরগুপ্ত এই রক্ষণশীল মতবাদে বিশ্বাসী ।

এদিকে প্রগতিপন্থীরা প্রাচীন ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ও জাতির চেতনার দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে চাইলেন। এতে দেশীয় ঐতিহ্যকে যেমন অস্বীকার করা হল না তেমনি দেশের বা জাতির প্রয়োজনে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকেও সমর্থন করা হল। দেখা যাবে, আঠারো শতকের শেষ প্রান্তে একটি পঙ্গু মেরুদণ্ডহীন জাতি উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর মানচিত্রে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান নানা ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। আসলে উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালী জাতি জীবনের স্থবিরতা থেকে মুক্তির অন্বেষণ করে। আধুনিক শিক্ষালাভের ফলে যুগচিন্তা নায়কগণ প্রগতিমূলক চিন্তা চেতনার প্রচার করেন। যে মতবাদ বাঙালীকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা এনে দেয়।

জানা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মোটামুটি মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) সমসাময়িক কাল পর্যন্ত সময়ে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর, ডিরোজিও ও তাঁর সম্প্রদায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙালীর আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটাতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আত্মচেতনামূলক আন্দোলনকে গতিদান করতে যুগচিন্তা নায়কগণ সভা, সমিতি, পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেন । এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা (১৮১৫), ও 'ব্রাহ্মসভা' (১৮২৮), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মসভা' (১৮২৯) ডিরোজিওর 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিশেন' (১৮২৮) হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষানুরাগের ফসল 'সর্বতত্ত্বদীপিকাসভা' (১৮৩৩), 'বঙ্গ ভাষানুবাদ সমাজ' (১৮৫০), বেথুন

সোসাইটি (১৮৫১) প্রভৃতি বাঙালীর মনন চিন্তনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবাধি' (১৮২১), তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) এরপর ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সচিত্র পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'Hindoo Patriot' (১৮৫৩) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগে বাঙালীর চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ।

উনিশ শতকে আত্মচেতনা বিকাশের যুগে জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে অনেকে বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উগ্র আধুনিক, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মতের উদ্ভব হয় । উনিশ শতকে জাতিকে সমৃদ্ধ করতে যেসব মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মতবাদের সমর্থনে অনেকেই বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। এঁদের সাহিত্যই আমার গবেষণার বিষয়। এই অধ্যায়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনাগুলি বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা অন্বেষণ করা হবে। সেজন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত বাংলা রচনাগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

রাজা রামমোহন রায় ঃ

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/৭৪—১৮৩৩) উনিশ শতকের বিশাল কর্ম-কুরুক্ষেত্রের প্রথম ও প্রধান বীরপুরুষ। এক কথায় রামমোহন এদেশের নবজাগরণের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি 'ভারতপথিক'। রামমোহনের পরিবার ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতের আবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পিতা রামকান্ত রায় ও মা তারিণী দেবী, জন্ম ১৭৭২/৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার খানাকুলে। রামমোহনের প্রপিতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব সরকারের দক্ষ রাজকর্মচারী হওয়ায় 'রায়' উপাধি পান। তিনি চাকুরীর প্রয়োজনে মুর্শীদাবাদ থেকে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলের রাধানগর গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ নবাব সিরাজের কর্মচারী ছিলেন। এই ব্রজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায়, রামমোহন রায়ের পিতা। রামকান্ত প্রথম দিকে নবাবের অধীনে চাকুরী করতেন, পরে কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর কাছ থেকে তালুক ইজারা নিয়ে বিষয়কর্ম করেন এবং বর্ধমানের রাণী বিষণকুমারীর মোক্তার হিসাবেও কাজ করেন। এমন একটি পরিবারের সদস্য রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও সন্ধিযুগের শিক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি পাঠশালায়, চতুষ্পাঠী ও মক্তবে এবং পরে পাটনায় আরবি ও ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। শোনা যায়, এই সময় রামমোহন

রায় অ্যারিষ্টটলের চিন্তা চেতনা ও একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে কাশীতে হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ডিগ্‌বী সাহেব নামক এক সাহেবের সহযোগিতায় সার্থক ভাবে ইংরেজী ভাষা শেখেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

আমাদের স্থবির জীবনকে 'চরৈবেতির' মন্ত্রে দীক্ষিত করতে রামমোহনের ছিল নিরলস কর্মপ্রয়াস। তিনি এই স্থবিরতা থেকে মুক্তিদানের জন্য নানারকম সংস্কারমূলক কাজ করেন। তাঁর প্রধান কাজ হল মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং সংস্কারমূলক আন্দোলন হল ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার। তিনি এই সংস্কারমূলক আন্দোলনকে গতিদানের জন্য সভা, সংগঠন পরিচালনা ও পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সভা-সমিতিতে ও পত্রিকার পাতায় তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে নতুন দর্শন প্রচার করেন। এখানেই শেষ নয় — রামমোহন শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যুগোচিত মতামত দেন।

রামমোহন ধর্মপ্রাণ স্বদেশে ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেজন্য তিনি প্রাচীন ভারতের বেদ-বেদান্ত থেকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এর আদর্শ প্রচার করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কার করেন। তিনি জানতেন, এদেশের মানুষ অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। এখানেই শেষ নয়, এদেশের অনেক মানুষ নিজ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্যকে ঘোষণা করতে গিয়ে অন্য সম্প্রদায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করতে দ্বিধা করে না। তিনি এরকম একটি ধর্মপ্রাণ সমাজের কিছু মঙ্গল করতে গিয়ে প্রথমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মকে সংস্কার করে নিতে চাইলেন। বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বসবাস এই দেশ। এদেশেরই প্রাচীন ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় শাস্ত্র বেদান্ত বা উপনিষদ থেকে একেশ্বরবাদকে প্রচার করে ধর্মীয় উন্মাদনায় মত্ত মানুষগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করেন। 'তহতুল মোহদ্দীন' নামে একটি ফারসী গ্রন্থ রচনা করে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। কলকাতায় আসার আগেই রংপুরে ডিগবি সাহেবের অধীনে কাজ করার সময় তিনি মাঝে মাঝে ধর্মীয় সভা করতেন। ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসী, মৌলবী প্রভৃতি অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে তিনি ধর্ম বিষয়ে নানা রকম আলোচনা করতেন।

সমাজসংস্কার রামমোহন রায়ের জীবনের অন্যতম মহৎ কর্ম। যেহেতু আমাদের দেশ ধর্মপ্রাণ, তাই ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থের দ্বারা তিনি সমাজ সংস্কার করার চেষ্টা করেন। রামমোহন বর্ণবৈষম্য ও নারী-পুরুষে ভেদাভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই বিষয়ে তাঁর বাংলা গ্রন্থ হল 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১ম ও ২য় ১৮১৮), 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'বজ্রসূচী' (১৮২৭), 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯) প্রভৃতি। রামমোহনের সমাজ সংস্কারের সবচাইতে বড় সাফল্য সতীদাহ প্রথা রদ (১৮২৯)।

উনিশ শতকের প্রথম ও প্রধান যুগচিন্তা নায়ক রাজা রামমোহন রায় মধ্যপ্রাচ্য, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে অনুভব করলেন— দেশের মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মান লজ্জাজনকভাবে নিম্নমুখী। তিনি সমসাময়িক কালের মানুষের মঙ্গলের জন্য হয়ে উঠলেন নিরত চিন্তাশীল। রামমোহন রায় দেশীয় মানুষগুলির জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে চললেন। তিনি নানা অভিজ্ঞতা মূলধন করে ঋষি সুলভ চেতনার দ্বারা জাতির স্তব্ধগতিকে সচল করার এক দার্শনিক মন্ত্র দিলেন। তিনি বললেন;—

> "আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।" (৪)

রাজা রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ'-এর 'অনুষ্ঠান' অংশের শেষে এরূপ মন্তব্য জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নির্দেশ করে, এবং সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনীয় আধুনিক যুক্তিবাদকে গ্রহণ করার উদার মানসিকতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারতীয় শাস্ত্র ভারতবর্ষের অর্ন্তবিষয়ক জ্ঞানের চরম প্রকাশ, আর যুক্তিবাদ সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের সামগ্রী। রামমোহন রক্ষণশীলের মত প্রাচ্যের সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলেন না আবার নব্যপন্থীদের মত পাশ্চাত্যের যাবতীয় বিষয়কে অনুকরণ করারও পক্ষপাতী নন। বরং জাতীয় ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে বাস্তব জীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবনাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। অর্থাৎ রামমোহন রায় জাতীয় জীবনের উন্নতির লক্ষে একটি প্রগতিপন্থী দর্শনের সৃষ্টি করেন। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাঙালীকে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে হলে এরকম একটি যুগোচিত ভাবনার প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় উপলব্ধি করেন এবং তিনিই প্রথম জাতিকে আধুনিক জীবন রহস্য আস্বাদন করার প্রেরণা দেন।

রামমোহন রায় বেদান্তকে তৎকালীন বিকলাঙ্গ ভারতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী শক্তি মনে করতেন। তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে শাস্ত্রের প্রকৃত সত্য প্রচার করেন। রামমোহন বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। ঋষি সুলভ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুভব করলেন, এদেশের মানুষের বাস্তব জীবনের ভীত শক্ত করতে হলে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। রামমোহন সারা জীবন ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখি বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনীহার বৃত্তান্ত। এবিষয়ে তাঁর মতামত এরকম;—

> "If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system

of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction,embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful science, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus." (৫)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, যে রামমোহন সংস্কৃত ভাষার বেদান্তকে জীবনের পাথেয় করেছিলেন, সেই রামমোহন কি করে লর্ড আর্মহার্ষ্টকে চিঠিতে বললেন — বেদান্ত চিন্তার জগৎ বা সংস্কৃত শিক্ষার জগৎ থেকে মুক্ত হওয়া জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক। এখানে রামমোহনের স্ববিরোধী মনোভাব স্পষ্ট। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি কি করে এমন একটি উদ্ভট কথা বলেন। এই প্রশ্নটির উত্তর অতি সহজেই পাওয়া সম্ভব; যদি রামমোহন রায়কে একজন স্বদেশ প্রেমিক মনে করে সমস্যা সমাধানের পথে এগোই। রামমোহন জানতেন, সরকারী সহযোগিতা পেলে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব। তাছাড়া সংস্কৃত শিক্ষা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে তেমন কাজে আসে না। বাস্তব বা ঐহিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন। সরকারী সহযোগিতায় এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলে সমৃদ্ধ দেশীয় অধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক জ্ঞানেও দেশ সমৃদ্ধ হবে। এবং ভারতীয়রা এই দুটি বিষয়কে আত্মস্থ করলে পৃথিবীতে সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারবে। রামমোহন রায়ের সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ঠিক এখানেই। এভাবে বিচার করলে রামমোহনের অন্তরে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমেরই সন্ধান মেলে।

কলকাতায় আসার পর তিনি 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) নামে একটি সভা গঠন করেন এবং এখানেই তিনি তাঁর উদার বা স্বাধীন মতামত প্রচার করতেন। সে সময় কলকাতার অনেক জ্ঞানীগুণী এই সভার সভ্য ছিলেন। এখানেই রামমোহন আপামর দিক্‌ভ্রষ্ট বাঙালীকে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে যথার্থ পথ-নির্দেশ করে জাতির জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নিরলস চেষ্টা করেছিলেন। একই উদ্দেশ্যে রামমোহন 'ব্রাহ্মসভা' (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'ব্রাহ্মসভা' সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে খুব জরুরি ছিল। কেননা, হিন্দু কলেজের নব্যবঙ্গগোষ্ঠী দেশীয় সমস্ত বিষয়ের উপর ক্রমশ আস্থা হারাতে বসেছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত

দেশের সাধারণ যুবক ক্রমশ দেশীয় হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে বিদেশী খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে যুক্তি ও শাস্ত্র নির্ভর ধর্মমতের প্রবর্তন অত্যন্ত জরুরি ছিল। পাশাপাশি রক্ষণশীলদের সংকীর্ণ প্রভাব থেকে মুক্ত করতেও 'ব্রাহ্মসভা' ছিল যুগোপযোগী।

রামমোহন শুধু সভা-সমিতি করেই বসে থাকেন নি। তিনি তাঁর প্রগতিশীল মত ও পথকে আরো ব্যাপক প্রচার এবং জনপ্রিয় করার জন্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) ও 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) নামে পত্রিকা দুটিতে মিশনারিরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের বিষয়ে নানা কুৎসা প্রচার করে। রামমোহনের মত স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশীয় ধর্মের নিন্দা সহ্য করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করে নিজ মতাদর্শকে দেশবাসীর কাছে প্রচার করেন। তিনি ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) পত্রিকাতে মিশনারিদের পত্রিকায় প্রকাশিত কুৎসার উপযুক্ত জবাব দেন এবং তিনি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নানা প্রগতিশীল মত ও পথের আলোচনা করেন। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রক্ষণশীল। প্রগতিশীল মত ও পথ তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংসর্গ ত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) নামে একটি নতুন পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রামমোহন সংগঠন, সভা ও পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল মতামত প্রচার করেছিলেন দেশীয় বিকলাঙ্গ জাতিকে সুস্থ ও সবল করার জন্য। ধর্ম সংস্কারের মত সমাজ সংস্কার, দার্শনিক চেতনা উদ্ভাবন, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাচেতনা, শিক্ষা, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে যুগোচিত ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব — যা বাঙালীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ভাষার প্রসঙ্গে বলা যায়, রামমোহন মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা চর্চা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাগুলি বাংলা ভাষায় বা 'লোকভাষা'য় হওয়ায় বাংলা গদ্য বিশেষ উপকৃত হয়েছিল।

রামমোহন জীবনে যা কিছু করেছেন তা দেশ ও দশের জন্যই। তাঁর যা কিছু ক্রিয়াকলাপ তার প্রেরণা স্বদেশ হিতৈষণা। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, রামামোহন রায়ের জাতীয়তাবাদী ভাবনা বা দেশানুরাগ কি আন্তর্জাতিকতার প্রতিকূল নয়। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হলেও রামমোহনের জাতীয়তাবাদ উদার প্রকৃতির। তিনি মানব সভ্যতার অবমূল্যায়ন থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। একটি জাতিকে মানুষের মত করে বাঁচতে শেখানোটা কখনোই আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হতে পারে না। তাছাড়া তিনি শুধু এদেশবাসীর উন্নতির চিন্তা করেই কর্তব্যের ইতি ঘোষণা করেন নি। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মানুষের জন্য তিনি তাঁর মহৎ ভাবনাকে আবদ্ধ করার মত ব্যক্তি তিনি নন। আমরা জানি,

রামমোহন রায় বেদ-উপনিষদের একান্ত ভক্ত। প্রাচীন এই সব শাস্ত্রে সর্বভূতে ব্রহ্ম বা সাম্যের কথা বলা হয়েছে। তাই রামমোহন রায়ের মত একজন অকৃত্রিম বেদ-উপনিষদের ভক্ত ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী মানুষকে মানুষ মনে করবেন, আর পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষকে মানবিক মর্যাদা দেবেন না—এ হতে পারে না। তাই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের স্বাধীনতার সংবাদ যখন পেতেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। এবিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন;—

> "স্পেনের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি রক্ষা পাওয়ার সংবাদে তিনি এতটা উল্লসিত হয়েছিলেন যে, নিজ বাসভবনে য়ুরোপীয় বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন।"(৬)

সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহন বিজাতীয় ইংরেজদের কখনোই শত্রু মনে করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন ঐ বিদেশীরা আরো বেশ কিছুদিন রাজত্ব করুন। রামমোহন রায় চেয়েছেন, এদেশবাসী বিদেশী রাজপুরুষদের সংস্পর্শে থাকুক। রামমোহন প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—

> "ইংরেজের এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করানো বিশেষভাবে সমর্থন করতেন।...তিনি মনে করেছিলেন, শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত ইংরেজদের ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে বাস করলে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে।" (৭)

একসঙ্গে থাকতে চাওয়া কখনোই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের পরিপন্থী নয়। অবশ্য তিনি মনে করতেন, বিদেশীরা এদেশকে উন্নত করে একদিন চলে যাবে। অতএব রামমোহন রায়ের বেদ-বেদান্তের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস, বিদেশী রাজপুরুষদের সংস্পর্শে থাকতে চাওয়া, বিশ্বের কোন প্রান্তে স্বাধীনতার সংবাদে আনন্দিত হওয়া প্রভৃতি কখনোই আন্তর্জাতিকতার প্রতিকূল মনোভাব নয়। আবার একই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, রামমোহনের এই আন্তর্জাতিক ভাবনাতেও স্বদেশ ভাবনার অস্তিত্ব বিরাজমান। তাই বলতে হয়, রামমোহনের চেতনায় জাতীয়তাবাদ বা স্বদেশ ভাবনা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সুগভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধে ভরপুর।

এবারে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা রচনায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করব। পণ্ডিতেরা খাতায় কলমে বাংলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরের বেশী প্রমাণ করেছেন। তবুও উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল না। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় স্বনামধন্য গদ্যশিল্পী। তিনি বাংলা গদ্য ভাষার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন এবং তাকে বাঙালীর চিন্তাজীবনের বাহন করে তুলতে চেয়েছেন। সেদিনের দুর্বল বাংলা গদ্য ভাষাকে তিনি ভারতীয় সাধনার গূঢ় তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করার মতো যোগ্য করে বাংলা সাহিত্যে অমর আসন লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরো একটি জায়গায়। এক হাজার বছরের বেশী পুরানো বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রামমোহনই প্রথম

সচেতনভাবে জাতির উন্নতিকল্পে কলম ধরেন।

রামমোহন রায় রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির বিষয় বা আবেদনের ভিত্তিতে সাতটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হল। গ্রন্থগুলির শ্রেণী বিভাগ এই রকম;—

ক) বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ

১। 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)

২। 'বেদান্ত সার' (১৮১৫)

৩। 'পঞ্চোপনিষৎ' ('তলবকার উপনিষৎ' ১৮১৬, 'ঈশোপনিষৎ' ১৮১৬, 'কঠোপনিষৎ' ১৮১৭, 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' ১৮১৭, 'মুণ্ডকোপনিষৎ' ১৮১৯)

খ) বিতর্ক নির্ভর গ্রন্থ বা সমালোচনামূলক গ্রন্থ

১। 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬—১৭)

২। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' ১৮১৭

৩। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' ১৮১৮

৪। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' ১৮২০

৫। 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' ১৮২০

৬। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ১৮২২

৭। 'পথ্যপ্রদান' ১৮২৩

৮। 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' ১৮২৬

গ) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গ্রন্থ

১। 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' ১৮১৮

২। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' ১৮১৯

৩। 'সহমরণ বিষয়' ১৮২৯

ঘ) ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক গ্রন্থ

১। 'গায়ত্রীর অর্থ' ১৮১৮

২। 'আত্মানাত্ম বিবেক' ১৮১৯

৩। 'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং' ১৮২৭

৪। 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' ১৮২৮

৫। 'অনুষ্ঠান' ১৮২৯

৬। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' ১৮২৬

ঙ) নীতিমূলক গ্রন্থ

১। 'প্রার্থনা পত্র' ১৮২৩

২। 'বজ্রসূচী' ১৮২৭

৩। 'ব্রহ্মোপাসনা' ১৮২৮

চ) খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও মিশনারিদের হিন্দু নিন্দার প্রত্যুত্তর

১। 'ব্রাহ্মণসেবধি' ১৮২১

২। 'পাদরী ও শিষ্য সম্বাদ' ১৮২৩

ছ) ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ

১। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ১৮৩৩

—উল্লিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করলে একটি বিষয় সহজেই স্পষ্ট হবে যে, রামমোহন রায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য কলম ধরেন নি। তিনি দীর্ঘ দিনের অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার থেকে বাঙালী জাতিকে মুক্ত করার জন্য বাংলায় গদ্য চর্চা করেন।

ক) বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ ঃ

রাজা রামমোহন রায় অনুভব করেছিলেন, ধর্মভীরু দেশীয় সমাজে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর না করলে জাতীয় জীবনের উত্তরণ সম্ভব হবে না। তিনি সর্ব প্রকার কুসংস্কার বর্জন করে যুক্তিপূর্ণ মন নিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি বা আচার আচরণের থেকে একেশ্বরবাদ অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক। এবিষয়ে রামমোহনের প্রথম রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর কথা বলা যায়। সমকালীন বাঙালীর বহুদেবতাবাদ বা ধর্মীয় কুসংস্কারের পরিবর্তে একেশ্বরবাদের সমর্থনে 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা করতে গিয়ে ভূমিকায় বলেন,—"প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্তনিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম।"[৮] তিনি মনে করেন, এ দেশবাসী সত্যিকারের ঈশ্বরকে সেবা করার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই এই অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে রামমোহন বেদান্ত বা উপনিষদের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করলেন। এবং তাকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে রামমোহন বাংলা গদ্য ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে 'বেদান্ত' ও 'উপনিষদ'-এর বাংলা অনুবাদ করেন।

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর 'ভূমিকা' অংশে প্রথমেই বেদান্তের মূলবিষয় যে ব্রহ্ম সে কথার উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়;—"বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।" (৯) 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্তসার' ও উপনিষদের অনুবাদ করে রামমোহন ব্রহ্মের কথাই বলেছেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর ভূমিকায় তিনি বলেন;—

> "....অনেকেই কখন পশুপক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত-শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।।" (১০)

তাঁর মতে, প্রচলিত রূপগুণ বিশিষ্ট দেবতা বা মানুষ কখনই আমাদের উপাস্য হতে পারে না। ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজ করেন। স্বার্থপর শোষক একটি শ্রেণী এই সর্বময় ব্রহ্মকে ছেড়ে পশু, পাখী, মাটির মুর্তি, পাথর প্রভৃতিকে উপাস্য হিসাবে প্রচলন করে। রামমোহন বিস্মিত হয়ে বলেন,—আমাদের সামান্য বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবোধ থাকলে এরকম কুসংস্কারকে কখন মেনে নিতে পারব না। তাঁর মতে এরকম কুসংস্কারের পিছনে রয়েছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বেদান্ত শাস্ত্র। যদি বেদান্ত শাস্ত্রের জ্ঞান এ দেশবাসীর প্রতিটি নর-নারীর থাকত, তাহলে স্বার্থপর শোষক চক্রান্তকারী একটি শ্রেণী পুতুল পূজা খেলার প্রচলন করতে পারত না। সেজন্যই তিনি মাতৃভাষায় বেদান্ত শাস্ত্রকে অনুবাদ করেন। কেননা, অনেকে পণ্ডিতের মুখের কথার উপর ভরসা রেখে ও পূর্বশিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সত্যিকারের কথা না জেনে গড্ডালিকার প্রভাবে ভেসে চলে। তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে রামমোহন বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদে ব্রতী হন।

রামমোহন শুধু অনুবাদই করেন নি, তিনি এই অনুবাদে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা সাহিত্যকে নতুন মাত্রা এনে দেন। 'পরব্রহ্ম'এর উপাসনা যে একমাত্র পথ সেকথা 'ভূমিকা'য় অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রূপগুণ বিশিষ্টের উপাসনার বিরোধিতা করে রামমোহন রায় বলেন,—কোন ব্যক্তি যদি অল্প বয়সে, জ্ঞান হবার আগে বাবাকে হারায়, তাহলে সে যুবক বয়সে বাবার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া বা মঙ্গলকামনা করার সময় সামনে যে কোন বস্তুকে পিতা বলে গ্রহণ করতে পারে না। বরং সে বলে "যে জন জন্মদাতা তাহার শ্রেয়

হউক"[১১] ব্রহ্ম ঠিক তেমন। রূপগুণের অতীত হলেও জগতের কোন নশ্বর বস্তু তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। যুক্তি ও বুদ্ধির উপর ভরসা রেখে রামমোহন আরো বলেন—যে মত পূর্বপুরুষেরা মেনে আসছেন তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা ঠিক নয়। পূর্বপুরুষের সবকিছুই যে ঠিক নয় বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করলে তা প্রমাণিত হবে। ব্রহ্মের উপাসনা করলে বাস্তব জ্ঞানশূন্য হতে হয়, তাই গৃহস্থের ব্রহ্মের উপাসনা ঠিক নয়। এর উত্তরে রামমোহন বলেন—নারদ, জনক, ব্যাস, শুক, বশিষ্ঠ, কপিল প্রমুখ ব্রহ্মজ্ঞানী কেউই বাস্তব জ্ঞানশূন্য ছিলেন না। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সাকার উপাসনার কথা আছে,—অতএব সাকার উপাসনা ঠিক। এরকম প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সাকার উপাসনার কথা থাকলেও বলা হয়েছে "ব্রহ্মের রূপকল্পনামাত্র।"[১২] এবং যাদের মন অত্যন্ত দুর্বল পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সাকার উপাসনা তাদের জন্য।

উল্লিখিত যুক্তিগুলির দ্বারা রামমোহন দেশবাসীকে ধর্মীয়ক্ষেত্রে পুতুল উপাসনা বা নশ্বর বস্তুর উপাসনা থেকে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেন। কেননা, এক শ্রেণীর চক্রান্তকারী মানুষের ষড়যন্ত্রে স্বদেশবাসী মূল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মের উপাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। স্বদেশবাসীর এই লাঞ্ছনা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাই তিনি 'বেদান্ত গ্রন্থ'এর 'অনুষ্ঠান' অংশের শেষে দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়েছেন—তারা যেন কোনরকম গুজবে কান না দেয়। এবং তাঁর কথাগুলি যেন দেশকালের পটভূমিতে বিচার করেন। রামমোহন বলেন;—"এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন এ মত হয় বিশ্বাস করিবেন না।"[১৩] প্রসঙ্গত রামমোহনের দর্শনটি পুনরায় উল্লেখ করতে হয়, তিনি স্বদেশবাসীকে পরামর্শ দেন;—"আমাদিগ্যের উচিৎ যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।"[১৪] অর্থাৎ দেশীয় পণ্ডিতের সাধনার ফসল শাস্ত্র গ্রন্থের শাশ্বত বাণীকে পাথেয় করে এবং মন থেকে সবরকমের সংকীর্ণতা মুছে ফেলে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে উনিশ শতকের বাঙালীকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রামমোহন রায় সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ঐ দু'টি বিষয়কে সমকালীন বাঙালীর স্থবির জীবনে প্রয়োগ করলে জাতীয় জীবনে অভাবনীয় উন্নতি হতে বাধ্য।

রামমোহন জাতির উন্নতির মহৎ উদ্দেশ্যে পণ্ডিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত বেদান্তকে 'লোকভাষা'য় অর্থাৎ বাংলায় সহজ সরল করে অনুবাদের চেষ্টা করেন। এদেশবাসী সম্বন্ধে তিনি জানতেন,— "অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না"। [১৫] কিন্তু বেদান্তের বক্তব্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করায় যাঁরা বিরক্ত, রামমোহন তাদের ছেড়ে দেননি। তাঁদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন নানাভাবে সংস্কৃত বেদের ভাষান্তর হওয়ার কথা। রামমোহন অকাট্য যুক্তি দিয়ে বলেন গীতা, পুরাণ, পঞ্চমবেদ মহাভারত পণ্ডিত মহাশয়েরা ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে গুরুগম্ভীর দার্শনিক বিষয়গুলি

কিন্তু বাংলাতেই বোঝান। কিংবা আলাপ আলোচনা বা শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রের কাছে ঐসব শ্লোক উচ্চারণও করে থাকেন। সেজন্যই তিনি বলেন;—"যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন।" (১৬) এখানে রামমোহনের মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ বেদান্তের মূল সত্য বস্তুকে জেনে ইহলোকে ও পরলোকের জন্য সঠিক পথটি বেছে নেয়।

'বেদান্তসার', 'বেদান্তগ্রন্থ'এর সারানুবাদ।এখানেও রামমোহন 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-এর কথাই বলেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর মানব প্রীতি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে লিখেছেন;—"বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে সে দেবতার পূজ্য হয়েন" (১৭) কিংবা "ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল দেবতারা পূজা করেন।"(১৮) পরিশেষে রামমোহন তাঁর গ্রন্থের সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার কথাও বলেন। তাঁর ভাষায়;—"বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন।" (১৯) এখানেও তিনি দেশবাসীর বুদ্ধি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে তিনি জানেন, বুদ্ধির প্রয়োগ ভিন্ন আধুনিক জীবন অচল।

রাজা রামমোহন রায় মোট দশখানি উপনিষদের অনুবাদ করতে চাইলেও 'পঞ্চোপনিষৎ'এর অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদিত উপনিষদের মূল বিষয় ব্রহ্ম। 'ঈশোপনিষৎ'এর 'ভূমিকা'য় তাই তিনি বলেছেন;—

> "এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বরের এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়।" (২০)

অর্থাৎ রামমোহন উপনিষদগুলির অনুবাদ করে 'পরব্রহ্ম' বা 'একেশ্বরবাদ'ই যে একমাত্র মুক্তির পথ তা নির্দেশ করেন। স্বদেশবাসী এই গুরুগম্ভীর দার্শনিক বিষয়গুলি যাতে সহজে বুঝতে পারে, সে দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি লিখেছেন;—"...সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে" (২১) এইসব বক্তব্যকে রামমোহনের নিজস্ব বলে যারা প্রচার করেন, তাদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে রামমোহন বলেন—তবে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রমুখ কবিদের রচনাগুলিও নিশ্চিত নতুন বিষয়। অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদ' কোন নতুন বিষয় নয়, কালের প্রবাহে অজ্ঞানতার ফলে সাধারণ স্বদেশবাসী তা ভুলে গিয়েছে। তাই তিনি পূর্বনির্দিষ্ট সঠিক পন্থা পুনরায় স্মরণ করে দিয়ে জাতির উন্নতির অন্যান্য দিকগুলির মত ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সচেতনতা আনতে চেয়েছেন।

খ) বিতর্কনির্ভর বা সমালোচনামূলক গ্রন্থ ঃ

রাজা রামমোহন রায় উদার ও মুক্ত মন নিয়ে জাতির উন্নতির জন্য যে নবজাগরণ এনেছিলেন, অনেক পণ্ডিত সহজে মানতে চাননি। একটি নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ছোট বড় নানা আকারে ঢেউ উঠবে তেমনি ঘুণে ধরা নিস্তরঙ্গ বাঙালী সমাজে রামমোহন রায়ের সংস্কারের ঢেউ ওঠায় অনেক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিষ্ণুভক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ওরফে ভট্টাচার্য্য, চৈতন্য ভক্ত গোস্বামী, ছদ্মনাম ধারী কবিতাকার, সুব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রী, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, নন্দলালঠাকুর প্রমুখ রামমোহনের প্রবর্তিত মতকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করেন। রামমোহন রায়ের বিখ্যাত বিতর্ক নির্ভর বা সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ 'উৎসবানন্দবিদ্যাবাগীশের সহিত বিচাব' (সংস্কৃত), 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', গোস্বামীর সহিত বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'সুব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার', 'চারিপ্রশ্নের উত্তর', 'পথ্যপ্রদান', 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' গ্রন্থের দ্বারা রামমোহন স্থবির বাঙালী সমাজে চিন্তাবিপ্লবের সূচনা করেন। তাছাড়া এই বিতর্ক বা সমালোচনামূলক রচনার দ্বারা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সমালোচনামূলক সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। রামমোহনের বিতর্কমূলক বা সমালোচনামূলক রচনার প্রসঙ্গে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'-এর কথা বলা যায়। 'ভূমিকা'তে রামমোহন 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সমালোচনা করে লেখেন;—

> ''সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।।...দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠা এবং পংক্তির নির্দ্দেশপূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।।'' (২২)

এখানে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সমালোচনা লক্ষ করা গেল।

গ) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গ্রন্থ ঃ

রাজা রামমোহন রায় জরাগ্রস্ত একটি জাতিকে স্বচ্ছন্দগতি দান করতে চেয়েছেন। সেজন্য তাঁর নিরলস কর্মপ্রয়াস কখনো থেমে যায় নি। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করলেন, সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাবে এদেশের নারীরা যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। তাই তাঁর বক্তব্যে নারীমুক্তির বাণী শোনা গেল। আধুনিক যুগে তিনি প্রথম বাঙালী, যিনি নারীর বেদনাকে মানুষের বেদনার মর্যাদা দিলেন। নারী শুধু ভোগ্যপণ্য বা

পুরুষের দাসীই নয়, তাঁরাও রক্তমাংসের মানুষ; এই সত্যটি সেদিন রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন। আর নারীর মানবিক অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি পুনরায় হাতিয়ার করেছিলেন শাস্ত্রজ্ঞান ও মানুষের যুক্তিবোধকে। কেননা, তিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও মানুষের যুক্তিবোধকেই ঘুণেধরা বাঙালী জাতির উন্নতির চাবিকাঠি বলে মনে করতেন। রামমোহন বলেন, এদেশে নারীদের সামান্য পশুপাখীর মত জীব মনে করা হয়। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষের মহৎ গুণ বা ধর্ম। অথচ পুরুষের কাছ থেকে এদেশের নারীরা তা পায় না। তাঁর ভাষায়;—

> "স্ত্রীদাহ পুনঃ ২ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ২দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবেদের অত্যন্ত দয়া হয়।" (২৩)

রামমোহন রায় নারী জাতির প্রতি পশুর মত্যাচরণ বন্ধ করে মানবিক আচরণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।

'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' গ্রন্থটি প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচনা ও গ্রন্থটি বিতর্কমূলক। গ্রন্থের সূচনায় 'প্রবর্ত্তক' আশ্চর্য হয়ে বলেন সহমরণ এদেশের একটি প্রচলিত প্রথা। দীর্ঘদিনের এই প্রথাকে কেন তুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। নিবর্ত্তক যেন বিস্মিত হয়ে বলেন;— "তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।" (২৪) এরপর 'প্রবর্ত্তক' অঙ্গিরা মুনি, হারীত মুনি, পরাশর বচন, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে 'সহমরণ'ই যে পথ, তা বলেন। এদিকে 'নিবর্ত্তক'ও 'মনু' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাই বিধবার প্রকৃত বিধি। কিন্তু একটা বিতর্ক থেকে যায়—তাহলে সহমরণ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। রামমোহন এই সমস্যারও সমাধান করেন। তিনি বলেন, যদি মনুর বিপরীত কথা কোন শাস্ত্রে থাকে তাহলে মনুর মতকেই গ্রহণ করতে হবে। রামমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে লিখেছেন;—

> ".....মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন।। যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভৈষজং।। যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি।। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।। মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে।" (২৫)

অতএব সহমরণের মতো নৃসংশ প্রথাকে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। পরিশেষে রামমোহন বলেন;—"……এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।" (২৬) —এই সমাপ্তি বাক্যে রাজা রামমোহন রায়ের অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম লক্ষ করা যায়। তাঁর ভাবনায় স্ত্রীবধের জন্য দেশের অসম্ভব ক্ষতি হচ্ছে। এই 'অনিষ্ট' বা ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাছাড়া 'তিরস্কার আর হইবেক না'—এই বক্তব্যেও তাঁর মনের নির্ভেজাল স্বদেশপ্রেমের সন্ধান মেলে। কেননা, রামমোহনের মতো সচেতন মানুষগুলি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, এরকম একটি বর্বর প্রথার জন্য বিদেশীদের কাছে লজ্জিত হতে হচ্ছে। এই দেশ সম্বন্ধে বিদেশীরা ভুল ধারণা পোষণ করছে। তাই রাজা রামমোহন রায় মনে করতেন জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য এই বর্বর প্রথা বন্ধ করা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য।

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' গ্রন্থেও সহমরণের মতো অমানবিক প্রথাটি বন্ধ করার আহ্বান করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ব্যাপারে রামমোহন কিছু অকাট্য যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বিরোধী পক্ষের একাধিক অভিযোগকে একে একে খণ্ডন করেন। রামমোহন বলেন—নারীদের যে অল্পবুদ্ধি বলা হয়, এটি শুধু সন্দেহ মাত্র। কেননা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে কোনদিনও শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় নি। তাঁর ভাষায়,—"আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" (২৭) স্ত্রীলোক অস্থির মানসিকতার এই অভিযোগের বিরুদ্ধে রামমোহনের যুক্তি—যে দেশের নারী মৃত্যুর উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করার কৃত সংকল্প করে সে দেশের নারী অস্থির মতির অপবাদ বহন করতে পারে না। আর 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'সানুরাগা' প্রসঙ্গে রামমোহন বলেন, এই অভিযোগ দু'টি বরং পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশ্বাসভঙ্গ এবং একাধিক বিবাহের রেকর্ডে পুরুষই অগ্রগণ্য। যাঁরা বলেন, এদেশের নারীর ধর্মভয় নেই, তাঁদের বিরুদ্ধে রামমোহনের বক্তব্য "এ অতি অধর্ম্মের কথা" (২৮) বরং নারী ধর্মরক্ষার জন্য দুঃখ, অপমান, তিরস্কার সবই সহ্য করে। উনিশ শতকের প্রথমেই নারী সম্বন্ধে রামমোহনের এরকম প্রগতিশীল ভাবনা আমাদের বিস্মিত করে।

গ্রন্থশেষে রামমোহন রায় সহমরণের মতো নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথা বন্ধ করার জন্য সমাজপতিদের আন্তরিক আবেদন করেন। তিনি বলেন;—"দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" (২৯)

'সহমরণ বিষয়'-এ রামমোহন উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের মতো সহমরণ প্রথা বন্ধ করার বিষয়ে আবেদন করেছেন।

ঘ) ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক ঃ

এখানে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়,—

১। গায়ত্রীর অর্থ

২। আত্মানাত্ম বিবেক

৩। গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা বিধানং

৪। ব্রাহ্ম সঙ্গীত

৫। অনুষ্ঠান

৬। ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ

যদিও এই বিভাগ ত্রুটি মুক্ত নয়, তবুও ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে বিষয় করে রচিত হওয়ায় এরকম বিভাগ করা হল।

আমাদের ভারতীয় সমাজ ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকে বাদ দিয়ে এই জাতির জন্য বৃহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। আর তাই রামমোহন রায় ধর্মকে নিত্যসঙ্গী করে জাতির উত্তরণের সোনালী স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন— আমাদের উত্তরণের জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ। তিনি শাস্ত্র জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে 'একমেবাদ্বিতীয়ং'কেই উপাসনার কথা বলেন। উক্ত গ্রন্থগুলি এই 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-এর তত্ত্ব ও উপাসনার রীতি এবং পদ্ধতির গ্রন্থ বলা যায়।

ঙ) নীতিমূলক ঃ

রাজা রামমোহন রায় শুধু ধর্মীয় তত্ত্বকথা বা সমাজসংস্কার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। বৃহত্তর মানব সমাজের উন্নতির জন্য নৈতিক চেতনার উদ্বোধন ঘটানোর চেষ্টা করেন। রামমোহন যেন অনুভব করেছিলেন, মানুষের নৈতিক চেতনার উন্নয়ন না করলে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ গড়া সম্ভব নয়। সেজন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি কয়েকটি নীতিমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নীতিমূলক গ্রন্থগুলির পাতায় আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, তা হল মানবিক মূল্যবোধ। রামমোহনের একাধিক গ্রন্থের মধ্যে 'ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্মসূচী' ও 'প্রার্থনা পত্র' তিনটি গ্রন্থকে নীতিমূলক রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'ব্রহ্মোপাসনা' রচনাটিতে রামমোহন মানুষের নৈতিক কর্মের দু'টি দিকের কথা বলেছেন। যথা;— পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা এবং অপরের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ও সাধু ব্যবহার। তিনি বলেন, ভালো ব্যবহার করা মানুষের নৈতিক কর্তব্য। কেননা মন্দ ব্যবহার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই সমাজে শান্তিতে বসবাসের জন্য পরস্পর ভালো ও সাধুব্যবহার করা উচিত।

'বজ্রসূচী' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে রাজা রামমোহন রায় আমাদের সমাজের জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করেছেন।

তিনি প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। কেননা, তিনি জানেন—তাতে জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। সেজন্যই রামমোহন বৌদ্ধ মহাজন সম্প্রদায়ের এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি বলেন জীবাত্মা, দেহ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পাণ্ডিত্য ও কর্মের ভেদে ব্রাহ্মণ হয় না। তাঁর মতে;—

> "করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়,"(৩০)

অর্থাৎ এই গ্রন্থটিতে রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করে তাঁর প্রগতিশীল মতকেই প্রতিষ্ঠিত করেন।

'প্রার্থনা পত্র' নামে ক্ষুদ্র রচনাটিতে রামমোহন রায় অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত করেন। গ্রন্থের নাম করণ করেন 'সবিণয় প্রার্থনা'। লেখকের প্রার্থনা হল—আমাদের মনে যেন সাম্প্রদায়িকতা স্থান না পায়। তাহলেই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করা যাবে, নচেৎ সম্ভব নয়।

চ) খ্রীষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের সমালোচনা ও মিশনারিদের হিন্দু নিন্দার প্রত্যুত্তর ঃ

রাজা রামমোহন রায় মিশনারিদের হিন্দু নিন্দায় যে গভীরভাবে-মর্মাহত হয়েছিলেন তারই সাহিত্যিক প্রমাণ 'ব্রাহ্মণ সেবধি' এবং 'পাদরী ও শিষ্য সম্বাদ' নামক গ্রন্থদু'টি।

শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ এদেশীয় হিন্দুধর্মের নিন্দা করতেন 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) ও 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) নামে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। রামমোহন তাতে মর্মাহত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত মনে হতে পারে, শ্রীরামপুরের কর্মকর্তারা দেশীয় প্রচলিত হিন্দুধর্মের নিন্দা করলে 'একেশ্বরবাদী' রামমোহন রায়ের মর্মাহত হওয়ার তো কিছু নেই। এর উত্তর পাওয়া অত্যন্ত জটিল। যদি রামমোহন রায়কে একজন স্বদেশ হিতৈষী মনে করে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হই, তাহলে সহজেই একটি সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে। হিন্দুধর্ম এদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম। এই অধিকাংশ মানুষের ধর্মকে নিন্দা করার অর্থ হল, এদেশের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করা। একজন স্বদেশ প্রেমিক অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াকে কিছুতেই সহ্য করবেন না। তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক গ্রন্থে স্বদেশের মানুষের স্বার্থে তার প্রতিবাদ করেন। শুধু প্রতিবাদ করেই তিনি থেমে থাকেন নি, ঘূণেধরা হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথমেই রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বাংলাদেশের মত নিঃস্ব ও পরাধীন দেশে শোভা পায় না। তিনি একরকম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন যে, যদি সামর্থ থাকে তাহলে 'তুরকী' ও 'পারসিয়া'র মতো স্বাধীন দেশে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করুন। রামমোহন বলেন;— "যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভর ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন...।"[৩১] অর্থাৎ তুর্কী বা পারসিক প্রভৃতি স্বাধীন দেশে মিশনারিদের ধর্মীয়ক্ষেত্রে এদেশের মতো বাড়াবাড়ি করলে ধর্মীয় নিষ্ঠার যথার্থ প্রকাশ পাওয়া যাবে। আসলে রামমোহন বিশ্বাস করতেন, ওই সব স্বাধীন দেশে খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্ম নিয়ে বাড়বাড়ি করার ক্ষমতা নেই।

রাজা রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ে সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ'। এই পুস্তকে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদের সমালোচনা করেন। সম্ভবত তিনি খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার বিষয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ করে এজাতীয় গ্রন্থের অবতারণা করেন।

ছ) বাংলা ভাষা বিষয়ক ঃ

উনিশ শতকের গোড়াতেই রামমোহন ভাষাবিজ্ঞানীর মতো মানুষের মুখের ভাষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তাই তিনি সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ জ্ঞানীগুণী মানুষের সাধনার ফলকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার কথা বলেন। তাঁর ধারণা মাতৃভাষা মানুষ সহজেই বুঝবে এবং গুরুগম্ভীর যুগোচিত ভাবনাকে মাতৃভাষায় প্রচার করলেই এদেশের মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি মুছে যাবে। রামমোহনের বাংলা ভাষা চর্চা করার পিছনে ঐ বিষয়টি কাজ করেছে। রামমোহন শুধু বাংলা চর্চাই করেন নি। বাংলা ভাষাকে প্রকৃত জানার জন্য 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) রচনা করেন।

অতএব বাঙালী জীবনের উন্নয়নের জন্য ধর্মীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক অনাচার দূরীকরণ, নারীকে মানবিক মূল্য দান, নৈতিকতার প্রদর্শন, বাংলা ভাষা ও স্বদেশীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও মানুষকে স্বাধীন চিন্তা করতে শেখানোর মহৎ উদ্যোগ রামমোহনের বাংলা রচনাগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যাকে আমরা স্বদেশভাবনা বলে অভিহিত করতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) মতো একজন যুগচিন্তা মহানায়কের আবির্ভাব যুগান্তকারী ঘটনা। জাতির দুর্দিনে তাঁর মতো একজন স্বদেশপ্রেমিক 'প্রমোদশয্যায়' সুখে দিন কাটাতে পারেন

নি। তিনি দেখলেন, শিক্ষার অভাবে জাতি প্রকৃত সত্যকে ছেড়ে নানা 'দেশাচারে' মত্ত। তাঁর ক্লান্তিহীন মহৎ কর্মপ্রয়াসের অন্তরালে দেশবাসীকে মানবিক অধিকার দানের বিষয়টি প্রকাশ পায়। সেদিনের পঙ্গু জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করে জাতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষে তিনি মূলত দু'টি বিষয়ের দিকে মনোযোগী হলেন। প্রকৃত শিক্ষার (আধুনিক শিক্ষা) প্রচলন ও জাতির মন থেকে 'দেশাচার' (কুসংস্কার) বর্জনের জন্য আন্দোলন।

বিদ্যাসাগর বাংলার কর্মভূমিতে আবির্ভূত হয়ে যে বৈশিষ্ট্যটির দ্বারা সবাইকে অভিভূত করেছিলেন, তা হল তাঁর 'অনমনীয় বীর্যবান ব্যক্তিত্ব'। আমরা লক্ষ করব, বিদ্যাসাগরের এই অনমনীয় ব্যক্তিত্বও এক গভীর স্বদেশ প্রেম থেকে উৎসারিত। জন্মকালে পিতামহ বিদ্যাসাগরকে 'এঁড়ে বাছুর' বলে রসিকতা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থে এঁড়ে বাছুর বলার যৌক্তিকতা আছে। বিদ্যাসাগরের পিতামহ বলেন;—

> "ইহাকে "এঁড়ে বাছুর" বলিবার কারণ এই যে, এ বালক এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে হইবে। যাহা ধরিবে, তাহাই করিবে, কাহাকেও ভয় করিবে না। এই বালক ক্ষণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ও পরম দয়ালু হইবে, ইহার যশোগীতের চারিদিক পূর্ণ হইবে, ইহার জন্মগ্রহণে আমার বংশের অক্ষয় কীর্তিলাভ হইল। এই জন্য ইহার নাম রাখিলাম ঈশ্বরচন্দ্র।" (৩২)

বিদ্যাসাগর সমকালের বাঙালীর চরিত্রের অনেক বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যেমন উচ্চবর্ণের দেশাচারে মগ্নতা, উচ্চবিত্তের উদ্যোমহীন সুখস্বপ্ন বিলাসিতা, শিক্ষিত শ্রেণীর অনুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি। এসব বিষয় বিদ্যাসাগরের জেদি স্বভাবকে আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল।

শিশুর স্বভাবিক প্রতিভাকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। সেসময়ের বাংলার পারিপার্শ্বিক পটভূমি বিদ্যাসাগরের একগুঁইয়েমী স্বভাবকে সযত্নে লালন পালন করেছিল। যদি তাঁর জেদি - তেজদীপ্ত স্বভাব না থাকত, তাহলে তিনি জাতির জন্য যতটুকু কাজ করেছিলেন, তা সম্পন্ন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। হয়ত তাঁর মহৎ সংকল্পগুলি অকালে প্রয়াণ পেত। অতএব, বিদ্যাসাগরের জন্মগত 'এঁড়ে' পরিচয় ও বাল্যকালের 'একগুঁইয়েমী' স্বভাব পরবর্তীকালে সযত্নে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের শীর্ষ সীমায় উন্নীত হয়েছে। দাবী করা যায়, তাঁর স্বদেশ ভাবনা অনেকাংশে বাস্তব পূর্ণতা পেয়েছে জেদি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

বিদ্যাসাগর 'দেশাচার'কে সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে সংক্রামক ব্যাধির মতো একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধি মনে করতেন। ধর্মের বিকৃত রূপ বা পচাগলা রূপ 'দেশাচার' এর বিরুদ্ধে তিনি আজীবন আন্দোলন করেছিলেন। সে সময় ধর্ম বলতে বোঝাত জাতপাত, বর্ণবৈষম্য, স্বার্থান্বেষী উচ্চবর্ণের নানা আচরণ বিধি, যা মূল ভারতীয় ধর্ম বা শাস্ত্রের বিকৃত মত ও পথ। তাঁর মতো একজন স্বদেশপ্রেমিক এই দেশাচারের বিরুদ্ধাচারণ করবেন—

এটাই স্বাভাবিক। আর তাই বিদ্যাসাগর দেশাচারে মগ্ন সমাজকে সংস্কার করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া ছাড়া বাল্যবিবাহ রদ, বহুবিবাহ রদ, শূদ্রছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার প্রভৃতি নানা সংস্কারমূলক আন্দোলন একটি পঙ্গু বা অসুস্থ জাতিকে সামান্য হলেও সুস্থতা ও সবলতা দান করতে সক্ষম হয়েছিল।

দেশাচারে মত্ত দেশীয় সমাজকে সুস্থ করতে হলে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা মুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর এই বিষয়টি গভীরভাবে অনুভব করেন এবং প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। কর্মজীবনে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে, এই বিষয়ে ভাবনার আরো অবকাশ পান। তিনি প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কখনো সরকারী সুযোগকে কাজে লাগানোব চেষ্টা করেন, কখনো বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ। কেননা, বিদ্যাসাগর এদেশের নির্যাতিতা নারী জাতির জন্য অনেক অধিকার আদায় করে দিয়েছিলেন। সেই অধিকারকে স্থায়িকরণের জন্য ও নারীকে নিজের মানবিক মর্যাদা নিজেই রক্ষা করতে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সেজন্যই হয়ত নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। এই যুগচিন্তা নায়ক জাতিকে শিক্ষিত করার জন্য অকৃত্রিম চিন্তা করেছিলেন। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, বাঙালীকে প্রকৃত শিক্ষিত করতে হলে প্রথমে বাংলা ভাষার উন্নয়ন প্রয়োজন। নতুবা জাতীয় শিক্ষার মান কোনদিনও উন্নতি হবে না। এবং মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,—মাতৃভাষা চর্চাকারীদের দু'টি বিষয়ে নজর দিতে হবে — প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষা জানা, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন।

বিদ্যাসাগর মনে করতেন, সংস্কৃত ভাষা খুব ভালোভাবে জানলে সহজ সরল বাংলা ভাষা চর্চায় বুৎপত্তি হবে। এই সহজ সরল মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করতে হবে। তাহলেই জাতীয় ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে সার্থকভাবে শিক্ষা দান করা সম্ভব হবে। এই জন্যই তিনি তাঁর সংস্কৃত কলেজকে একটি মডেল কলেজ রূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত কলেজে যাঁরা পড়বেন, তাঁরা দেশহিতৈষী মনোভাব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন। জাতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষে তিনি নিজেও বাংলা ভাষা চর্চা করেছিলেন এবং একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমের আরো নিদর্শন পাওয়া যায়, ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে তাঁর সচেতন উদাসীনতার মধ্যে। আমরা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করলে বুঝব যে, এখানে তাঁর মনের একটি দ্বন্দ্ব লুকিয়ে আছে। তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষ অধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ কিন্তু ঐহিক বা বাস্তবজ্ঞান একেবারেই শূন্য। তাই তিনি শঙ্করাচার্য-কপিলদেব প্রমুখ দার্শনিকের মত ও পথ ছেড়ে বেন্থাম-মিল প্রমুখ

দার্শনিকের দর্শন গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি অনুভব করেছিলেন জাতির উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য দর্শন জানা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ছাত্র যদি জগৎকে মিথ্যা জানে তাহলে দেশের জাগতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। দেশের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর বললেন বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্যদর্শন মিথ্যা মত ও পথ। বিদ্যাসাগর অন্ধভাবে এরকম কথা বলার মানুষ নন। তিনি অন্য আর একটি জায়গায় বলেন, জ্ঞান চোখ খুলে জীবনের সব কিছু বিচার করে দেখা উচিত। এখানে বিদ্যাসাগর উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

তাছাড়া ধর্মবোধ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে উদাসীন ছিলেন। প্রশ্ন জাগতে পারে, বিদ্যাসাগর ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে আদৌ উদাসীন ছিলেন কি না। আমরা জানি, সে সময় ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য অনেক স্বদেশ হিতৈষী নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এও হতে পারে তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ কর্মপ্রয়াসের জন্য হয়ত ওই সব বিষয়ের প্রতি তিনি নীরব ছিলেন। যদি সেসময় বিশ্বাসযোগ্য কোন নেতৃত্ব না থাকত তবে দেশীয় ধর্ম ও দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তিনি এগিয়ে আসতেন না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

বিদ্যাসাগর তাঁর লেখনীতে দেশীয় শাস্ত্রের বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধার বিষয়টি ব্যক্ত করেন। আমরা জানি, দেশীয় শাস্ত্রগুলি দেশীয় ধর্ম রক্ষার নিয়ম বিধি। দেশবাসী দেশীয় শাস্ত্রের প্রকৃত মত না মানার অর্থ দেশীয় ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা। এই বিষয়টি বিদ্যাসাগর সহ্য করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের অবনতির মূল অন্বেষণ করলে শাস্ত্রকে না মানার কারণটি খুঁজে পাওয়া যাবে। অতএব বিদ্যাসাগর দেশীয় ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন,—এমন মত প্রতিষ্ঠা করা যায়। আসলে ধর্মের সঙ্গে দেশাচার ও সাম্প্রদায়িকতা এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, বিদ্যাসাগর সমকালের প্রচলিত ধর্মের ধারে কাছে ঘেঁষতে চান নি।

এগুলি ছাড়াও তিনি পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্য জেনেও দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত চিঠিতে হিন্দু দেবদেবীর নাম ব্যবহৃত হত। জানা যায়, ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। দেশীয় পোষাক পরিচ্ছদ ছেড়ে বিলিতি পোষাক গ্রহণ করেন নি। বিদ্যাসাগরের এইসব ক্রিয়াকলাপগুলি সবই যে যুক্তি আশ্রিত বা Practical ধর্মী—তা নয়। তবুও ব্যক্তিগত জীবনে এগুলিকে মেনে চলতেন। এতে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বিদ্যাসাগর স্বদেশপ্রেমের খাতিরে অনেক সময় যুক্তি আশ্রিত বিষয় নয় এমন কিছু বিষয়ের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন। তাতে তাঁর মনের সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

আর একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা আবশ্যক তা হল — রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানি, অর্থনৈতিক শোষণ ও বৃহত্তর সামাজিক বৈষম্যের বিষয়ে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে স্বোচ্চার হন নি। তবু বলা

যায়, এই নীরবতা তাঁর পক্ষে কোন কলঙ্কের নয়। আমরা জানি, বিদ্যাসাগর হৃদয়বানের জীবন্ত বিগ্রহ। অন্যের দুঃখ লাঞ্ছনা দেখলে তাঁর চোখে জল আসত। যদি দেশের চরম দুর্দশা, পরাধীনতা, ঔপনিবেশিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতির জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের মতো পরিবেশ থাকত, তাহলে তিনি কিছুই করতেন না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাঁকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা এমন মত কিছুতেই মানবেন না। ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগর জাতপাত, বর্ণবৈষম্য মানতেন না। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য কেউ চাইলে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। সর্বোপরি তিনি মানবতার অবমাননা দেখলে প্রতিবাদ করতেন। তাই বিদ্যাসাগর উল্লিখিত বিষয়ে যদিও সেরকম কিছুই করেন নি, তবুও তাঁর পক্ষে সেটি বিশেষ দোষার্হ নয়। স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কিছু করা তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভব ছিল না। দূরদর্শী বিদ্যাসাগর এব্যাপারটি বুঝেছিলেন। সেজন্যই হয়ত তিনি নীরব ছিলেন। চোখ কান খোলা রেখে নিজের বাস্তব ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে স্বজাতির জন্য যা করেছেন, তা অবশ্যই মহৎ ও বৃহৎ। বাঙালী যতদিন বেঁচে থাকবে, বিদ্যাসাগরের ঋণের কথা চিরদিন মনে রাখতে বাধ্য।

আমরা লক্ষ করব, বিদ্যাসাগর দেশের উন্নতি বা জাতির মঙ্গল কামনায় চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে সেই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাসাগরের রচিত সাহিত্যের আন্তরিক প্রেরণা—কখনো দেশবাসীর মনের কুসংস্কার মোচনের তাগিদ, কখনো দেশবাসীকে প্রকৃত শিক্ষা দানের চিন্তাভাবনা, কখনো জাতীয় ভাষা উন্নয়নের প্রচেষ্টা, কখনো বা এদেশের দীর্ঘদিনের নির্যাতিতা নারী জাতির দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে অধিকার আদায়ের জন্য মরমী আবেদনে সমৃদ্ধ। সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের মানবিক মূল্যবোধের সচেতনতা তাঁকে জাতির মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের বাংলা রচনাগুলির বিষয় মূলত সমাজ সংস্কার, শিক্ষামূলক ও জাতীয় ভাষা সাহিত্যের উন্নতির ভাবনায় মুখর।

সমাজ সংস্কারমূলক বাংলা রচনা ঃ

সমাজের মানুষের উন্নত চিন্তাচেতনা না থাকলে উন্নয়ন অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী সমাজ উদার ও উন্নত চিন্তাচেতনা ছেড়ে কুসংস্কারকে গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের উদার ভাবনার প্রভাবে অনেক যুগচিন্তা নায়ক জাতির সামাজিক অন্ধত্বকে আক্রমণ করে প্রগতির কথা ভেবেছিলন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের একাধিক চিন্তানায়কের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি লক্ষ করলেন, এদেশের ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হবার নিয়ম, কুলীন ব্রাহ্মণদের একাধিক বিয়ের নিয়ম, বিধবা রমণীদের কঠোর ব্রত পালনের দুর্বিষহ নিয়ম; এছাড়া মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির মতো বিষয়গুলি সমাজকে অসুস্থ করে তুলেছিল। বিদ্যাসাগর এইসব সামাজিক দেশাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। তিনি

প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এই নিয়ম বিধিগুলি মূল শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে পৃথক মত ও পথ। এগুলি আসলে দেশীয় শাস্ত্র ও ধর্ম বহির্ভূত প্রথা। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার বিষয়ক বাংলা রচনাগুলি হল;—

ক) 'বাল্যবিবাহের দোষ'

খ) 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব'

গ) 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব'

ঘ) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'

ঙ) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার'

একথা ঠিক বিদ্যাসাগর জাতির সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদে বৃহত্তর কর্মপ্রয়াস গড়ে তোলন নি। কিন্তু অবহেলিত বৃহত্তর নিম্ন বর্ণের বাঙালী জাতির চেয়েও অবহেলার তলানিতে ঠেকে যাওয়া এদেশের নারী সমাজ। বিদ্যাসাগর এই চূড়ান্ত অবহেলিত নারী সমাজের প্রতি সামাজিক অবহেলা ও নির্যাতন দেখে গভীর ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর কর্মপ্রয়াসের বৃহত্তর ভাবনার অনেকটাই এদেশের নারী সমাজের জন্য ব্যয় হয়েছিল। তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিধবা বিবাহকে সমর্থন জানিয়ে ভাই শম্ভুচন্দ্রের কাছে মনোভাব ব্যক্ত করেন এই ভাষায়;—

> "বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোনো সৎকর্ম করিতেপারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এবিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি;" (৩৩)

সমাজের বিধবা নারীর করুণ বেদনা বিদ্যাসাগরের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল, তাই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রাণের ভয়কেও তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। এর চেয়ে দেশের নারী সমাজের প্রতি মহান আত্মোৎসর্গ আর কিছু হতে পারে না। এবারে আমরা বিদ্যাসাগরের সমাজ বিষয়ক গ্রন্থগুলি আলোচনা করব।

ক) 'বাল্যবিবাহের দোষ' (১৮৫০) ঃ

যদি কেউ বলেন 'বাল্যবিবাহের দোষ' যে বিদ্যাসাগরের রচনা তাঁর প্রমাণ চাই, তাহলে অন্য কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনীকার ও অনেক গবেষক প্রবন্ধটির আভ্যন্তরীণ বিষয়ের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন— 'বাল্যবিবাহের দোষ' বিদ্যাসাগরেরই রচনা।

যদি 'বাল্যবিবাহের দোষ' বিদ্যাসাগরের রচনা হয়, তাহলে তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক একাধিক গ্রন্থের মধ্যে এটিই প্রথম। বিদ্যাসাগরের মনে স্বদেশ প্রেম যে কত গভীর ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'বাল্যবিবাহের

দোষ' নামক প্রবন্ধটিতে। তিনি লিখেছেন;—"অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।" (৩৪) কিংবা তিনি আরো বলেছেন;—

> "অস্মদেশীয়েরা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্পবয়সেই স্থবির দশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে।" (৩৫)

আবার বাঙালী জাতির মধ্যে বীরপুরুষের অভাব এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন;—

> "এই ভারতভূমিও বীর প্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।...এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়?" (৩৬)

—অতএব অল্প বয়সে বাঙালীর বিবাহ জাতির সর্বনাশের একটি মুখ্য কারণ নির্ধারিত হয়। যুগচিন্তানায়ক বিদ্যাসাগর বাঙালীর এরকম বৃহত্তর সর্বনাশের প্রতিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধে আরো কয়েকটি অমঙ্গলের কথা বলেন। যেমন বিদ্যাচর্চার ব্যাঘাত, ভালোবাসার বন্ধনে শীথিলতা, নিরক্ষর মায়ের সন্তানের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা, উপার্জনে অক্ষমের ফলে দরিদ্রতা, বাল্যবিবাহিত ছেলেদের বাল্য বয়সেই মৃত্যুর সম্ভাবনা এবং তার ফলে নারীর বাল্যেই বৈধব্য যন্ত্রণা প্রভৃতি অভিশাপ বাল্যবিবাহের চরম পরিণতি।

এই প্রবন্ধের দ্বারা বিদ্যাসাগর জাতিকে সুস্থ ও সবল জীবন ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন।

খ) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব ঃ

বিধবা বিবাহ প্রচলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহৎ মানবিকতার প্রকাশ। শুধু দৈহিক দিক থেকে নারী-পুরুষ আলাদা হওয়ায় নারীর একবারের বেশী বিবাহ নিষিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁকে সারা জীবন ধরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই সামাজিক বিধান বিদ্যাসাগরকে গভীরভাবে আহত করেছিল। তিনি নারী-পুরুষের আকাশ-পাতাল ভেদাভেদ দূরীকরণের জন্য বিধবাবিবাহের প্রস্তাব দেন। বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব'-এ বলেন;—"বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।" (৩৭) দেশীয় সমাজের এই অনিষ্ট দূরীকরণ ও বিধবাদের মানবিক মর্যাদা প্রাদান করবার জন্য বিদ্যাসাগর নেতৃত্ব দেন।

রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সরকারী সহযোগিতায় ইতিপূর্বে সহমরণের মতো একটি বর্বর প্রথা নিষিদ্ধ হয়। সহমরণ রদ হওয়ায় অথচ বাল্য বিবাহ প্রচলন এবং অধিকবয়স্ক ব্যক্তির বালিকা বিবাহের রীতি প্রচলিত থাকায় বালিকা বিধবাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর লেখেন;—

> "দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রমুখ অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন।" (৩৮)

তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটিয়ে এই যন্ত্রণার অবসানের কথা ভেবেছিলেন। তিনি আরো বলেন;—

> "যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।" (৩৯)

বিদ্যাসাগর জানেন যে, এমনিতে তাঁর কথা কেউ গুরুত্ব দেবে না। তাই বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত তা তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কেননা, ভারতীয়রা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে চলতে ভালবাসে। 'মনু', 'অত্রি', 'বিষ্ণু', 'হারীত', 'অঙ্গিরা', 'পরাশর', 'ব্যাস' প্রমুখ এদেশের ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। দেশবাসী এঁদের নির্দেশিত পথকে ধর্মশাস্ত্র অনুসারী মত ও পথ বলে মনে করে। কলিযুগের জন্য ধর্মশাস্ত্র হল 'পরাশর সংহিতা'। এই 'পরাশর সংহিতা' কলিযুগের মানুষের জন্য নির্দেশিত ধর্মপথ। 'পরাশর সংহিতা'য় বিধবাদের জন্য লেখা আছে;—

> "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।" (৪০)

—অর্থাৎ স্বামী হারিয়ে গেলে, মরে গেলে, ক্লীব হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে, অথবা পতিত হলে নারী পুনরায় বিয়ে করতে পারে। অবশ্য পরাশর কলিযুগের নারীর জন্য তিনটি বিধান দিয়েছেন যথা;— বিবাহ করা, সহমরণে যাওয়া ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করা। সহমরণ প্রথা রামমোহনের প্রচেষ্টায় পূর্বেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। এখন থাকল ব্রহ্মচর্য ও বিবাহের বিধি। এদিকে ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান প্রচলিত থাকায় সমাজে নানা ব্যভিচার দেখা দিচ্ছে। অতএব দেশীয় সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে হলে 'পরাশর সংহিতা' মতে বিবাহ বিধিই একমাত্র পথ। বিদ্যাসাগর এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে দেশবাসীকে বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

গ) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ

বিধবা বিবাহের প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অনেকেই এই প্রস্তাবকে উদ্দেশ্য করে নানা রকম প্রশ্ন করেন। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' হল পাঠকের জিজ্ঞাসার উত্তরমূলক গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর বলেন;—

> "আমি এই প্রত্যুত্তর প্রদান বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক, নিবিষ্ট চিত্তে; এই প্রত্যুত্তর পুস্তক অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন," (৪১)

বলা বাহুল্য এই গ্রন্থটিও বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত। কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল দেশাচারের দোহাই দিয়ে একটি শ্রেণী আছে যারা বিধবা বিবাহের বিরোধী। আলোচ্য গ্রন্থে ঠিক এরকম প্রসঙ্গ উঠলে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি মনের ছবিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই সময় তাঁর মনের অকৃত্রিম স্বদেশভাবনা অকপটে প্রদর্শিত হয়। তিনি দেশীয় শাস্ত্রের অমর্যাদার কথা স্মরণ করে বলেন;—

> "হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! ...এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপ প্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিকরক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।" (৪২)

—যারা দেশীয় ধর্ম বা শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নীরব থাকতে দেখেন, তাঁদের মতকে এরপর আর পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। দেশের দুরবস্থা লক্ষ করে বিদ্যাসাগর কতখানি ব্যথাতুর ছিলেন, তার সন্ধান পাওয়া যায় এই গ্রন্থেরই একটি অংশে;—

> "হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, ...কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক," (৪৩)

অন্য আর একটি অংশে দেশীয় মানুষের কর্মবিমুখতা বা উদাসীনতার প্রসঙ্গে বলেন;—"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে!" (৪৪) তিনি দেশীয় মানবগণকে জ্ঞান চোখ খুলতে বলেন এবং দেশীয় শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবহার করতে বলেন।

অতএব বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে যে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন তাতে দেশীয় অতীত ঐতিহ্য, দেশীয় শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন গর্ববোধ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে সমকালের দেশের দুরবস্থার বিষয়ে গভীর

বেদনায় দগ্ধ হয়েছেন এবং তা থেকে উত্তরণের সদুপদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মনের স্বদেশভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘ) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ঃ

এই গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ তখন এদেশে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। পুস্তকটি প্রকাশ কালে 'সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা' বহুবিবাহ রদের ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে তোলে। বিদ্যাসাগর সেজন্য এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বলেন;—

> "তাঁহারা, সদ্বভিপ্রায় প্রণোদিতহইয়া, যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।" (৪৫)

বহুবিবাহ যে সামাজিক একটি কুপ্রথা তা বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি পুস্তকটিতে বহুবিবাহের একটি তালিকা দিয়ে বহুবিবাহের প্রথাকে অমানবিক কুপ্রথা প্রমাণ করেন। এমনও লোক আছে যারা আশি-নব্বই টি পর্যন্ত বিয়ে করেছেন। এরকম বহুবিবাহ নারী জাতি তথা সচেতন বাঙালী সমাজের পক্ষে যথেষ্ট অপমানকর। তাই পুস্তকের শেষে বিদ্যাসাগর বলেন যে, "বহুবিবাহ প্রথা যে, যারপরনাই, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বোধ হয়, চক্ষুকর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না।" (৪৬)

অতএব এই পুস্তক রচনার দ্বারা বিদ্যাসাগর নারী জাতির দুরবস্থা মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সমাজের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন।

ঙ) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক' ঃ

বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক'-এ অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রাজকুমার ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রমুখ অধ্যাপক ও পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দান করেন। এই গ্রন্থে বহুবিবাহ প্রথা যে শাস্ত্র সম্মত নয় তা প্রমাণ করেন। যাঁরা বহুবিবাহকে শাস্ত্র সম্মত বলে দাবী করেন—তাঁদের মতের প্রতিবাদ করে বিদ্যাসাগর গ্রন্থের উপসংহারে বলেন;—

> "আমারবোধে, যে সকল মহাত্মারা, জগতের হিতের নিমিত্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্মবহির্ভূত লোকবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতি প্রদান বা অনুমোদন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে।" (৪৭)

এখানেও শাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদ্যাসাগর প্রচলিত বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা বন্ধ করার বাসনা প্রকাশ করেছেন।

চ) প্রতিপক্ষের প্রতি ব্যঙ্গধর্মী রচনা ঃ

বিদ্যাসাগর জাতির প্রগতির জন্য বা দেশীয় সমাজে অবাঞ্ছিত 'দেশাচার' দূরীকরণের জন্য সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেজন্য তিনি একাধিক প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেন। যাঁরা এইসব প্রবন্ধ পুস্তকগুলি যুক্তিহীন হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাদের নিয়ে—'অতিঅল্প হইল', 'আবার অতিঅল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন। এসব পুস্তকে বিদ্যাসাগর নিজের মত ও পথের সমর্থনে বিরোধী পক্ষকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেন।

শিক্ষামূলক বাংলা রচনা ঃ

এবার আমরা বিদ্যাসাগর রচিত শিক্ষামূলক গ্রন্থের বিষয়ে আলোচনা করব। জাতিকে কিভাবে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনার শেষ ছিল না। হয়ত সেজন্যই তিনি জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বাস্তব সম্মত প্রস্তাব তৈরী করতে পেরেছিলেন।

সার্থক শিক্ষা জাতিকে সমৃদ্ধ করে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, এই ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করতে না পারলে জাতি কোন দিনও সমৃদ্ধ হবে না। তাই এইসব শিশুদের কুসংস্কারমুক্ত বাস্তবসম্মত শিক্ষাদান করতে বিদ্যাসাগর ছিলেন বদ্ধ পরিকর। এদেশে এই বিষয়টিকে সার্থক করতে তিনি আদর্শনিষ্ঠ গ্রন্থকার ও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিদ্যাসাগর এসব পরিকল্পনা করে বসে না থেকে জাতির ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করার জন্য নিজে উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। তিনি 'বর্ণপরিচয়' থেকে শুরু করে সহজ সরল বাংলা ভাষায় কুসংস্কার মুক্ত যুগোপযোগী জ্ঞানসমৃদ্ধ পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ ঃ

'বর্ণপরিচয়' পুস্তক দু'টি বর্ণজ্ঞানহীনের বাংলা বর্ণজ্ঞানার্জনের বিজ্ঞানসম্মত বই। বিদ্যাসাগরের লক্ষ ছিল সহজভাবে শিক্ষা দান। 'বর্ণপরিচয়' সম্বন্ধে অনেক প্রবীণের মুখে শোনা যায় বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ যে পড়বে তার কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কোন গ্রন্থ পাঠ করা অসাধ্য হবে না। লোকশ্রুতিটি অমূলক নয়। বিদ্যাসাগর একজন যথার্থ শিক্ষাবিদের মতো বাঙালীর বর্ণপরিচয় দানের জন্য 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন।

নীতিমূলক গ্রন্থ ঃ (কথামালা ও নীতিবোধ)

শিক্ষার্থীর নৈতিক মানের উন্নয়ন ও সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধের জাগরণের কথা বিদ্যাসাগরের মাথায় ছিল, সেজন্য 'কথামালা' ও 'নীতিবোধ' অনুবাদিত এবং রচিত হয়। কথামালা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বিজ্ঞাপনে বলেছেন—"গল্পগুলি অতিমনোহর; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।" (৪৮) এরকম সদুপদেশমূলক আর একটি পুস্তক 'নীতিবোধ'। 'কথামালা' ও 'নীতিবোধ' পাঠ করলে শিক্ষার্থী নিজের জন্য যেমন নানা উপদেশ পাবে তেমনি পরিবার সমাজ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হবে। অতএব 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর 'মতিলাল' নামক চরিত্রটির মতো নীতিহীন, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধহীন চরিত্রের বিপরীত বাঙালী চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'কথামালা' ও 'নীতিবোধ' গ্রন্থদু'টির লক্ষ্য।

বোধোদয় ঃ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিষয়ক ভাবনার অন্যতম লক্ষ ছিল শিক্ষার্থীকে বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান দান করা। অথচ এদেশে বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার বিশেষ সুবিধা নেই। বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন;—"যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।" (৪৯) আর তাই 'বোধোদয়'-এর পাতায় বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে চেতনপদার্থ, অচেতন পদার্থ, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ, নদী, সমুদ্র, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের মতো বাস্তব সম্মত বিষয়।

'বোধোদয়'-এ কোন কোন সময় প্রত্যক্ষভাবে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতভাষা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন;—"অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।" (৫০) "সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।"(৫১) শিল্প, বাণিজ্য সমাজের আলোচনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুনরায় শিল্পের হারান গৌরব ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য উৎসাহ ব্যক্ত করেন।— "পূর্বকালে আমাদের দেশে শিল্পকর্মের বিশেষ উন্নতি ছিল। .....যাহাতে পুনর্বার উহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য সর্বপ্রকারে যত্নবান্ হওয়া উচিত।" (৫২)

চরিতাবলী ঃ

বিশ্ববিখ্যাত কিছু চরিত্রের সমাহার 'চরিতাবলী'র বিষয়। এঁরা দুঃখ কষ্টে বা প্রতিকূলতার মধ্যে লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে বিখ্যাত হয়েছেন। বিদ্যাসাগর চরিতাবলীর বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—

"যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালক দিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।" (৫৩)

অর্থাৎ পুস্তকটির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।

জীবনচরিত ঃ

'জীবনচরিত' পুস্তকে কোপার্নিকাস, গালিলিয়, নিউটন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মহাত্মাগণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর বলেন, এই পুস্তকের উদ্দেশ্য দুটি। যথা— মহাত্মাগণের জীবনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর জীবনে উপদেশ হিসাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ও মহাত্মাগণের আলোচনায় সমকালের রীতিনীতি, আচার ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। একটি বিষয় লক্ষ করার মতো যে, বিদ্যাসাগর এখানে কাল্পনিক বিষয়কে পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত না করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে উপযোগী ইউরোপের বিখ্যাত মহাত্মার জীবনকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস ঃ

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন বাস্তবমুখী শিক্ষা। মার্শম্যানের ইতিহাসের সহায়তায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনার পিছনে এদেশে বাস্তব সম্মত শিক্ষা দেবার বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব পূরণের জন্য 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনা করেন। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার কথাও ভেবেছিলেন।

এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর অনেকক্ষেত্রে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মতামত মানেন নি। যেমন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের নিকট অন্ধকূপ হত্যার জন্য সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেই অন্ধকূপ হত্যার বিষয়ে বিদ্যাসাগর সন্দেহ পোষণ করে সিরাজদ্দৌলাকে কলঙ্ক মুক্ত করার চেষ্টা করেন।

আখ্যান মঞ্জরী ঃ

'আখ্যানমঞ্জরী' তিনভণ্ডে বিভক্ত। এই পুস্তকটি ছাত্রদের জন্য রচিত। বিদ্যাসাগর 'আখ্যান মঞ্জরী'র 'বিজ্ঞাপন'-এ উদ্দেশ্যের কথা বলেন; —"যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।" (৫৪)

বাসুদেব চরিত ঃ

'বাসুদেবচরিত' ভাষা শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের সহজে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার জন্য লিখিত।

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনা ঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জাতীয় ভাষার সঙ্গে জাতির উত্তরণের বিষয়টিকে এক করে দেখেছেন। প্রসঙ্গঃ পুনরায় উল্লেখ করতে হয় যে, বিদ্যাসাগরই জাতীয় ভাষা সমৃদ্ধ করার বৈজ্ঞানিক প্রথা আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, ইংরেজী ভাষায় ধারণ করা জ্ঞান ভাণ্ডারকে প্রথমে জানতে হবে, এবং সেই জ্ঞান ভাণ্ডারকে সহজ সরল করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ভালভাবে সংস্কৃত ভাষা জানা। নইলে সহজ সরল বাংলা রচনার দক্ষতা জন্মাবে না।

বিদ্যাসাগর সহজ সরল বাংলা ভাষা সৃষ্টি করতে নিজেই কলম ধরেন। তাঁর বাংলা ভাষা সৃষ্টির মহৎ কাজটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী চিরদিন মনে রাখবে। বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে কলম ধরে তিনি যেন তাঁর উপযোগবাদের সঙ্গে শিল্পের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটাতে ভোলেন নি। তাঁর মতো একজন যুগচিন্তানায়ককে তাই জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি পর্বে ভাষা ও সাহিত্য চিন্তানায়ক বলে অভিহিত করা যায়।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রচনাগুলির মধ্যে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'-এর উল্লেখ স্বতন্ত্র ভাবে করা প্রয়োজন। কেননা, এই গ্রন্থে দেশীয় ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে লেখকের গৌরববোধ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি বলেছেন—"সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা"[৫৫] এবং উপসংহারে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে বলেন;—"সংস্কৃতভাষানুশীলনের নানা ফল" [৫৬] তিনি বলেন, পাশ্চাত্য শব্দবিদ্যার উন্নতির পিছনে ইউরোপীয়দের সংস্কৃত ভাষা অনু-শীলন অন্যতম কারণ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে জানতে সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন করা প্রয়োজন। বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উন্নতি করতে সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া সাহিত্য পাঠে যে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্যে তার সন্ধান মিলবে। অতএব বিদ্যাসাগরের চোখে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, বিশ্বভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। কালিদাস প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—"কোনও দেশের কোনও কবি—আমাদিগের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না"[৫৭] কিংবা " বোধহয়, —কোনও দেশের কোনও কবি উপমাবিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন" [৫৮]

বিশুদ্ধ সাহিত্য বলে বাংলায় তখন বিশেষ কিছু ছিল না। তখন সাহিত্য ছিল তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর। বড়জোর ছিল তীক্ষ্ম রঙ্গব্যঙ্গ ও কৌতুকময়তা। বিদ্যাসাগরই 'শকুন্তলা' বা 'সীতার বনবাস'-এর মতো রচনার দ্বারা মধুর রস, করুণ রস ও নিসর্গের প্রথম যথার্থ প্রয়োগ ঘটান। তিনি রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই জাতীয় সাহিত্যের এরকম রূপ দান করে সাহিত্য চিন্তানায়ক হিসাবেও সার্থকতা লাভ করেন। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনাগুলি হল;—'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'বিদ্যাসাগর চরিত',

'প্রভাবতী সম্ভাষণ', 'শব্দমঞ্জরী', 'শব্দসংগ্রহ'।

আমরা লক্ষ করব, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষা গঠনে যথেষ্ট সফল। ভাষা ক্ষেত্রে পূর্ণচ্ছেদ, সেমিকোলন, প্রভৃতির প্রয়োগ শিখিয়ে বাংলা ভাষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অতএব সমাজ সংস্কারে উদ্যোগ, সুশিক্ষা দানের পরিকল্পনা, বাংলা ভাষার প্রতি দরদ, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি মহৎ কাজগুলি বিদ্যাসাগরকে দেশানুরাগী বলে পরিচিত হতে সাহায্য করে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদেশের কিছু ব্যক্তি বাণিজ্য ও রাজপুরুষদের সহযোগিতা করে অসম্ভব ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার এরকম রাজনৈতিক পরিবর্তনের অতুল সম্পত্তির অধিকারী একটি পরিবার। বণিক রাজার সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১৮১৭—১৯০৫)। এই সময় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেখানেই পৌঁছে গিয়েছে সেখানে মধ্যযুগীয় চেতনা পড়েছে সংকটে। পাশাপাশি খ্রীষ্টান মিশনারি উদ্যোগে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেক নব্য বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট খ্রীষ্টান হওয়াটা গর্ব বলে বিবেচিত হত। অবশ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় প্রমুখ মিশনারিদের মাত্রাতিরিক্ত ধর্ম প্রচারের প্রতিবাদ করেন। শিক্ষিত অনেক যুবক রামোহনের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এর আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আবার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রমুখ রক্ষণশীল পন্থীর মধ্যে দেখা যায় চিরাচরিত ও প্রচলিত ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে এদেশে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। 'হিন্দুকলেজ' (১৮১৭), 'সংস্কৃতকলেজ' (১৮২৪) তখন বৃটিশ উপনিবেশ কলকাতায় আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এছাড়া ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রমুখের প্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বিদ্যালয় ও পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়।

বলা যায়, দেবেন্দ্রনাথ যখন স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন, ঠিক তার পূর্বেই জাতির প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায় পরলোক গমন (১৮৩৩) করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) তখনও দেশের বৃহৎ কর্মভূমিতে পদার্পণ করেননি। রামমোহন প্রদর্শিত মত ও পথকে অবলম্বন করে একটি গোষ্ঠী কোনরকমে বেঁচে ছিল, এই গোষ্ঠীর কোন যুগান্তকারী ভূমিকা ছিল না। তবে একথা স্বীকার

করতে হবে যে, রামমোহনের চিন্তাচেতনা বাঙালী সমাজে আগামী দিনের বড় বড় মনীষী আবির্ভাবের সঞ্জীবনী মন্ত্রবীজ রোপিত ছিল। ঠিক এমন সময় ভারতীয় ভাবধারাকে যথার্থ উপলব্ধি করে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে অক্লান্ত সৈনিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে বিলাসময় জীবন কাটাতেন। একদিন তাঁর পিতামহীর মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, এখান থেকেই দেবেন্দ্রনাথের প্রচলিত জীবন যাত্রায় প্রথম অন্যমনস্কতা। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন;—

> "ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল— 'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে'; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।" (৫৯)

দেবেন্দ্রনাথের কর্মপরিচয় ঃ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মবীর পুরুষ। দেবেন্দ্রনাথকে ছাড়া উনিশ শতকে বাঙালীর পরিচয় পূর্ণতা পাবে না। বাঙালী সমাজ তখন দিক্‌ভ্রান্ত। রক্ষণশীল, প্রগতিশীল ও নব্যবঙ্গীয়ের প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালী শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। ঠিক এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অতুল বিষয় সম্পত্তির সুখ বর্জন করে আপন উপলব্ধির দ্বারা রাজা রামমোহনের যথার্থ উত্তরাধিকারীর মতো বাঙালী সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ করার চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথের এরকম পরিবর্তনে পিতা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পিতার এই মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন;—

> "আমাদের বাড়ীতে বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না; যে-হেতুক, আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে বিষয়-বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্ম্মে কিছুই মনযোগ দেয় না।" (৬০)

দেবেন্দ্রনাথ এই বিষয় সুখ বর্জন করে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মহৎ ও বৃহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপদানের জন্য তিনি এরকম অনেক অপবাদ ও নিন্দা সহ্য করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতির জন্য

অবিস্মরণীয় কিছু কাজ করেছিলেন। যথা;— ব্রাহ্মধর্মের নেতৃত্ব, প্রগতিশীল চেতনার প্রসার, পত্রিকা ও সভা-সংগঠনের উদ্যোক্তা হওয়া, জাতির উন্নতির লক্ষে শিক্ষা প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও বাংলা গদ্য রচনা প্রভৃতি।

স্বদেশ ভাবনায় দেবেন্দ্রেনাথ ঠাকুর ঃ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কায়মনোবাক্যে ভারতীয় ছিলেন, তা তাঁর চিন্তায় ও কর্মে প্রকাশিত। তিনি জাতির ভবিষ্যতের গৌরবের সোনালী দিনের প্রস্তুতির যুগের এক কর্মবীর পুরুষ ছিলেন। রামমোহনের ঔপনিষদিক ভাবধারাকে দেবেন্দ্রনাথ যেন মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এদেশে ঔপনিষদিক চেতনার বিপ্লব ঘটান। তাঁর এই ঔপনিষদিক ভাবধারা প্রচারের পিছনে ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে একধর্ম স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য। তিনি লিখেছেন;—

> "তাঁহাকে উপাসনা করিয়া, তাহার ফল—আমি তাঁহাকে পাই। তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য; তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র;—এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়, সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল।" (৬১)

একধর্ম স্থাপনের ব্যাপারে তিনি আরো স্পষ্ট করে লেখেন;—

> "যখন উপনিষদে বহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম, এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ্ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা আমার সংকল্প হইল। ঐ উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত, সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে— আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।" (৬২)

এখানে আমরা লক্ষ করলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষে একধর্ম স্থাপন করে জাতির উন্নয়নে আন্তরিক প্রয়াসী। এই উদ্দেশ্যের পিছনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুগভীর স্বদেশ ভাবনাকে অনুভব করা যায়। উনিশ শতকের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ব্যক্তি যিনি সচেতনভাবে সম্পূর্ণ একটি পৃথক ধর্মের প্লাটফর্ম সৃষ্টি

করে সমগ্র ভারতবর্ষে একধর্ম ও এক জাতি গঠনের জন্য চিন্তাশীল ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মমতকে কতখানি সর্বজনীন করতে পেরেছেন,—সেবিষয়টি বিচার না করে বরং তাঁর একধর্ম মত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে অসীম আন্তরিকতা যে দেখা যায় সে বিষয়টি সত্যই বিস্ময়কর।

দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশীয় হিন্দুধর্মের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবকে ভালো চোখে দেখেন নি। উমেশ চন্দ্র সরকার ও তাঁর স্ত্রীকে অনেকটা জোর পূর্বক খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করায় তিনি খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন;—

> "ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল। —'অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। ...অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতিক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ।" (৬৩)

এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বধর্ম ও স্বসংস্কৃতির প্রতি সুগভীর দরদের পরিচয় পাওয়া গেল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু ধর্মকে নিয়েই মত্ত হয়ে থাকেন নি। বাঙালী জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত হতে গেলে প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সন্তানগণের শিক্ষায় সেকথা স্পষ্ট হয়। সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা দেবেন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছিল। সমসাময়িক কালে খ্রীষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার করা হত। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারে বিরক্ত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'হিন্দুহিতার্থী' (১৮৪৫) বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেন;—

> "১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদা পুস্তক লইয়া, তাহাতে

কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল।

এই সভা হইতে 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"(৬৪)

আমরা দেখলাম, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক কালে শিক্ষা দানের সঙ্গে ধর্ম প্রচারের যে কৌশল খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নিয়েছিল, সেই কৌশলকে তিনি ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ উদার ও আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তিনি প্রচলিত সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দেশী-বিদেশী ধর্মকে দূরে রাখার প্রতি মত দেন।

আমরা দেখব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম প্রচারের নেতৃত্ব দিলেও তিনি ছিলেন সমস্ত রকমের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। এখানে তাঁর উদার ও নিরপেক্ষ মনের প্রসঙ্গে বলা যায়;—

"ব্রাহ্ম সমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই, তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। যখন ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা— যখন ট্রষ্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আবার একদিন দেখি যে, সেই ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বোধ হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, এবং বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম।" (৬৫)

তাছাড়া তাঁর আদর্শকে প্রচার করতে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (১৮৪৩) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সভা, সমিতি ও পত্রিকাতে স্বদেশের মানুষের চেতনার প্রসার ঘটে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন;—

"...একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল। আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি।" (৬৬)

অর্থাৎ তাঁর সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিল দেশীয় মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানোর মহৎ উদ্যোগ। যা তাঁর স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

দেবেন্দ্রনাথ স্বজাতির আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটাতে গিয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি করেন। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি ব্রাহ্মধর্মের নীতি বা উপদেশে সমৃদ্ধ। যেমন;—'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন;—

"...জাতি, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধনা এই কয়টীই আত্মার উন্নতির কারণ; সকলের উপরে ঈশ্বরের প্রসাদ আবশ্যক, তাহা না হইলে কিছুই হইবে না। ...আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের নিত্যমঙ্গল ইচ্ছা এই যে, জগতে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক। ...জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে রাজ্যের উন্নতি; জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে বংশের উন্নতি; জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে প্রতি জনের হইলোকে, পরলোকে, অনন্তকালে উন্নতি।" (৬৭)

আবার 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান' নামক রচনায় তিনি বলেন;—

"যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। যখন বিষয়-লালসা আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যখন জীবনের মহান লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া নীচ চিন্তা মলিন কামনাতে মন অভিভূত হয়, তখন তাঁহাকে দেখিতে পাই না। অনন্তের মহিমা সেই জানে, যে বিষয় কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সমাহিত-চিত্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করে।" (৬৮)

তাছাড়া তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' (১৮৯৮)। দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর বাংলা গদ্যের চর্চা করেছিলেন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে তাঁর গদ্যসাহিত্য চর্চা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির সহায়ক। তিনি যদিও বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কিছু করেন নি, তবুও তাঁর পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই জন্যই হয়ত রবীন্দ্রনাথের মতো অবিস্মরণীয় কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলাকার কথা স্মরণ করতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়ে মহলে ঠেলে রেখেছিলেন; ...আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।" (৬৯)

অতএব বলা যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আত্মচেতনার বিকাশ ঘটাতে অক্লান্ত সৈনিক ছিলেন। সেজন্য এই অবিস্মরণীয় মনীষীর প্রতি বাঙালী চিরদিন শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবে।

অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব (১৮২০-১৮৮৬) মুহূর্তে এদেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চেতনা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। সরকারী সাহায্যে ইতিমধ্যে 'হিন্দুকলেজ' (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার এরকম একটি সময়ে বাঙালী জাতির উন্নতির জন্য প্রকৃত পথ-নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিখ্যাত সংবাদপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সফল সম্পাদক। তাঁর আরো একটি বড় পরিচয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানমনস্কতা। তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করে সমকালীন বাঙালীকে মুক্তির পথ দেখান। আর সেজন্যেই তাঁর গ্রন্থগুলি নৈতিকতা, বিজ্ঞান মনস্কতা, যুক্তিবোধ বা বুদ্ধি বৃত্তি, আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, সর্বোপরি বঙ্গসমাজে মানব সম্পদ বুদ্ধির বন্দনায় মুখর। আসলে তিনি উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে মানব সম্পদ বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। কেননা, প্রাক্ উনিশ শতকে আমরা দেখেছি বাঙালীর ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের চিত্র। এমনকি অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক কালেও (১৮২০-১৮৮৬) যার অস্তিত্ব জাতির অবক্ষয় থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছিল। সেকারণে বাঙালী সমাজের উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক দীর্ঘদিনের যুক্তিহীন জীবনাচরণ, কুসংস্কারে বিশ্বাস, সমকালের নৈতিক জ্ঞানের অধঃপতন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহহীনতা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলির জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। তাঁর বাংলা রচনায় তিনি কখনো নৈতিকতা, কখনো বিজ্ঞান মনস্কতা, কখনো চিন্তার স্বাধীনতা, কখনো তীক্ষ্ম যুক্তিবোধ ও বুদ্ধি বৃত্তির জয়গান, কখনো আধুনিক শিক্ষা লাভের প্রেরণা দিতেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থগুলি হল;—'ভূগোল'(১৮৪১), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'চারুপাঠ' (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯), 'হেয়ার সাহেবের সাম্বৎসরিক বক্তৃতা' (১৮৪৫), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১, ১৮৫৩), 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬), ''ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩)। উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে দু'টি উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। বালকের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ যথা;—'ভূগোল', 'পদার্থবিদ্যা', 'চারুপাঠ' এবং আপামর বাঙালীকে প্রয়োজনীয় নীতি উপদেশের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ যথা;—'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার','ধর্ম্মনীতি' ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার দত্ত অনুভব করেছিলেন, এদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের উপযোগী ভালো পাঠ্যপুস্তকের বড় অভাব। অবশ্য 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) নানারকম পাঠ্যপুস্তকের যোগান দিয়ে সে অভাব মোচনের চেষ্টা করেছিল। তবুও অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'ভূগোল' (১৮৪১), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) ও 'চারুপাঠ' (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯) সেকালে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও মনে রাখার মতো। তিনি 'ভূগোল' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন;—

> ''ইদানিং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে২ যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এদেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এভাষায় এপ্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে এ মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভি উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।''[৭০]

ভূমিকায় আমরা লক্ষ করেছি, গ্রন্থটি রচনার পিছনে অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশের স্বার্থকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই স্বার্থ হল স্বদেশীয় ভাষায় ভালো পাঠ্য পুস্তকের অভাব মোচন। যার দ্বারা এদেশের শিশুরা প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারে। তাঁর 'চারুপাঠ'-ও শিক্ষা জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে দেখি নায়ক মহেন্দ্র স্ত্রী আশাকে শিক্ষা দানের জন্য 'চারুপাঠ' পড়িয়েছে।[৭১] 'চারুপাঠ' যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত সেকথা লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত স্বীকার করেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি নজর দিয়েছেন। যথা;—বাস্তব জ্ঞান সমৃদ্ধ বিষয়ের উপর গুরুত্ব, গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে বিরক্তি না জন্মানোর জন্য সতর্কতা, পাঠকের বোধশক্তির বিকাশ প্রভৃতি। এবিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত নিজেই বলেছেন;—

"যেরূপ প্রস্তাব পাঠ করিলে, করুণাময় পরমেশ্বরের বিশ্ব-কার্য্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহাই ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। এসকল বিষয়ের আলোচনা অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক গল্প পাঠ অপেক্ষা সমধিক কল্যাণকর তাহার সন্দেহ নাই।

এক বিষয়ের অনেক প্রস্তাব উপর্য্যুপরি অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশবোধ হয়, এ নিমিত্ত প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্য ও চিত্ত-রঞ্জনার্থে, প্রয়োজনানুসারে, অনেক বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপও প্রকাশ করা গিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রণালী-সিদ্ধ-পুস্তক অতি অল্প। এ সময়ে বালক দিগের পাঠোপযোগী দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে, এই বিবেচনায় চারুপাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...বালকগণের শিক্ষা সাধন বিষয়ের অত্যল্প আনুকূল্য হইলেও, সমুদায় পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিয়া চরিতার্থ হইব।" (৭২)

অর্থাৎ এই 'চারুপাঠ' পুস্তকটি রচনা করতে গিয়েও অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশের স্বার্থকে সবসময় মনে রেখেছেন। এবিষয়ে গ্রন্থেই তাঁর মতামতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাবে 'স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন নামক আলোচনাংশে। এখানে তিনি একজন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। তিনি লিখেছেন;—

"অতএব, জনসমাজে অবস্থিতি পূর্ব্বক অপর সাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আত্মোদর পরিপূরণ ও আত্ম পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে। প্রতি দিবস আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজনিয়ম সংশোধিত ও সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্টিত হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবার প্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থে যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি পরিচালন করা যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল লোভ কামাদি নিকৃষ্ট রিপু সমুদায়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরম মঙ্গলকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে বিশিষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহার মত কি কার্য্য করিতেছি, ইহা সকলেরই এক এক বার চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয় ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত এবং ইহাই তাহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। এই পরম

মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সকলেরই বিধেয়। আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করা যে প্রকার আবশ্যক, সেইরূপ, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ বিমোচন ও সুখ সম্পাদনের পরামর্শ ও চেষ্টা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" (৭৩)

এখানে আমরা লক্ষ করলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশের প্রতি কতগুলি কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। যে সব দায়িত্ব পালন করা মানুষের কর্তব্য বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আপামর বাঙালীকে প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশের জন্য লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;— 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮৫১ ও ১৮৫৩) 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ও ২য়, ১৮৭০ ও ১৮৮৩)। এইসব গ্রন্থে মানব জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য, চিন্তার নিরপেক্ষতা, কল্পনা ও কুসংস্কারের পরিবর্তে বাস্তব জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপস্থাপন চোখে পড়ার মতো। ডঃ সুকুমার সেন বলেন;—

"পাশ্চাত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার সার্থকভাবে করেন সর্ব্বপ্রথম অক্ষয় কুমার" (৭৪)

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়;—

"অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে দুইভাগ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০। ১৮৮৩)। গ্রন্থটি অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, বাঙ্গালা ভাষায় একটি বিশিষ্টতম গ্রন্থ বটে।... উপক্রমণিকা দুইটিতে অক্ষয় কুমারের শ্রমশীল পাণ্ডিত্যের ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়), আর্য (ইন্দো-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য (বৈদিক ও সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এই প্রথম।" (৭৫)

আসলে সুকুমার সেন বলতে চেয়েছেন অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক বাঙালী। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন ভারতবাসী কর্তৃক প্রথম ভাষাবিজ্ঞানের অলোচনা করার গৌরব অক্ষয় কুমার দত্তকে অর্পণ করেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের বিখ্যাত একটি গ্রন্থ 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১, ১৮৫৩) আলোচনা করে আমরা তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব। এই গ্রন্থটিতে আপামর বাঙালীর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটি যে বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য সেকথা অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেন;—

"দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যকরূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পুর্ব্বাবধি নানাদেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম প্রয়োজক পণ্ডিতেরা এবিষয় বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যপি ভূমণ্ডলে রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব্ সাহেব-প্রণীত "কান্‌স্‌টিটিউশন আব ম্যান্" নামক গ্রন্থে এবিষয়ে সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিপালন প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে বাঙ্গালাভাষায় তাহার সার সংকলন পূর্ব্বক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ...ইহা ইংরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গতও উপকার জনক কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।" [৭৬]

অতএব, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধিই লেখক অক্ষয় কুমার দত্তের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমরা লক্ষ করব, অক্ষয়ককুমার দত্ত ধর্মপ্রাণ বাঙালীকে ধর্ম বিষয়ে সুচিন্তিত মুল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ধর্ম বলতে জপ, তপ, ধ্যান প্রভৃতি আচার সর্বস্বকে নির্দেশ করেন নি। আধুনিক যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এর দ্বিতীয় ভাগে, 'বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার' নামক দশম অধ্যায়ে তিনি বিদ্যার সঙ্গে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখিয়ে বলেন;— ".....বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের এ প্রকার সংযোগ হইলে, সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।" [৭৭] আর ধর্মের বিষয়ে তিনি 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন;—

"বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।" (৭৮)

তিনি আরো বলেন, বাস্তব কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করা মোটেই উচিত নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, আমাদের দেশে ধারণা প্রচলিত আছে যে ধর্ম বা পূণ্য অর্জন করতে হলে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণ নিতে হবে। উনিশ শতকেও এই ধারণা অপরিবর্তিত ছিল। এতে দেশের মানুষের ত্যাগ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পেলেও পরোক্ষে স্বদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। এতে এদেশের মানুষের বাস্তব কর্মের প্রতি অনেকটা শিথিল মনোভাব সৃষ্টি হয়। অক্ষয়কুমার সেজন্য 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে বলেন;—

"ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা সংসারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এই উপদেশ আমাদিগের স্বভাব বিরুদ্ধ। আমাদের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী, অতএব, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।"(৭৯)

অক্ষয়কুমার দত্ত জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধিতা করেন; তাঁর ভাষায়;—

"যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, যথার্থ কর্ম্ম সাধন সাংসারিক সুখের কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহাদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ও অনুরোক্তি হইবে।" (৮০)

কেননা, মানুষ চায়;—"দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা," (৮১) অক্ষয়কুমার দত্ত মানুষের কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে আরো লিখেছেন;—

"আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতিত হয়, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।" (৮২)

অক্ষয়কুমর দত্তের মতে, প্রচলিত ধর্ম যদি এই মহৎ কর্তব্য পালনে প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই ধর্মকে সংস্কার করতে হবে। তিনি বলেন ;—"অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার ঐক্য নাই তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য।"(৮৩) এখানে অক্ষয়কুমারের উদার ও বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বদেশীয় ধর্মের ঐতিহ্যের গৌরব করতে গিয়ে সংকীর্ণ হতে পারেন নি। আমাদের প্রচলিত ধর্ম যদি মানব কল্যাণে প্রতিকূল হয়, তাহলে সেই ধর্মকে তিনি সংশোধন করার কথা বলেন। এতে তাঁর ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষ মনের পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে। আমরা জানি, উনিশ শতকেও বঙ্গসমাজে ধর্মের নামে

নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যথা;—বর্ণবৈষম্য ও নারী-পুরুষে ভেদাভেদের মতো অমানবিক প্রথা, আচার-আচরণ প্রভৃতি ধর্ম বলে পরিচিত। অক্ষয়কুমার জানেন সমাজ থেকে ধর্মের নামে প্রচলিত উক্ত কুসংস্কারকে বর্জন করতে না পারলে বাঙালীর উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্যই তিনি 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে ধর্মের সংশোধন করা কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন। লেখক অক্ষয়কুমার ধর্মপ্রাণ বাঙালীর উন্নতির পক্ষে অন্তরায় প্রচলিত সংকীর্ণ ধর্মকে সংস্কার করার পরামর্শ দিয়ে বাঙালী সমাজের উন্নতির পথ-নির্দেশ করেছেন। যে নির্দেশ বা উপদেশ উনিশ শতকের বাঙালীর মুক্তির জন্য খুবই জরুরি। অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত বাংলা ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ বঙালী সমাজের ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ভাবনায় সমৃদ্ধ —সেকথা বলাই বাহুল্য।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী আপামর বাঙালীকে প্রকৃত মত ও পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। তাঁদের রচিত বাংলা রচনাও এই মনোভাবকে যথার্থ রূপে ব্যক্ত করে। আমরা লক্ষ করেছি—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষী সামাজিক, ধর্মীয় ও জীবনের অন্যান্য স্থবিরতা থেকে মুক্তির মন্ত্র শুনিয়েছেন। তাঁরা প্রয়োজনে যুক্তি-নির্ভর জীবনাচরণের প্রতি বাঙালীকে আকৃষ্ট হতে বলেন। কেননা বাঙালীর মুক্তির একমাত্র উপায় অন্ধবিশ্বাস, দেশাচার প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলি ত্যাগ করে প্রকৃত সত্যকে জানা। সেজন্য দাবী করা যায়—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার অস্তিত্ব বর্তমান।

উল্লেখপঞ্জী

১। বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (আধুনিক যুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ৩য় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণীমুদ্রণ ঃ ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯, পৃ: ৪৯৯।

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ এজ প্রথম সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬২, চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ভাদ্র, ১৩৯০, আগষ্ট ১৯৮৩, পৃ: ৭৮।

৩। সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, সম্পাদনা ঃ বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ—১ বৈশাখ ১৪০২, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর-১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, পৃ: ৩০২।

৪। অনুষ্ঠান, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১১।

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ এজ প্রথম সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬২, চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ভাদ্র, ১৩৯০, আগষ্ট ১৯৮৩, পৃ: ৮২।

৬। পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জী, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রথম পর্ব), অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ঃ ১৯৮৯, পৃ: ২৪২।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭।

৮। ভূমিকা, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ৭।

৯। ভূমিকা, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩-৪।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।

১৩। অনুষ্ঠান, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১১

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ: ১০

১৭। বেদান্তসার, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১২৩

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৪

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬

২০। ভূমিকা, ঈশোপনিষৎ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১৯৫।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৫

২২। ভূমিকা, ভট্টচার্য্যের সহিত বিচার, রামমোহন গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ১৫৫-১৫৬।

২৩। সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫০, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ১১-১২।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ: ১২।

২৭। সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫০, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ৪৬।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮।

৩০। বজ্রসূচী, রামমোহন গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ২৮।

৩১। ব্রাহ্মণ সেবধি, রামমোহন গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ৫।

৩২। বিদ্যাসাগর, শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, প্রথম আনন্দধারা সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭৬, পৃ: ৮।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৪।

৩৪। বাল্যবিবাহের দোষ, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ৩-৪।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।

৩৭। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৬৯।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৮।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৮-৫৭৯।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৩।

৪১। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৮২-৫৮৩।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৩।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৩-৬৮৪।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৪।

৪৫। বিজ্ঞাপন, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৬৮৬।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩০।

৪৭। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৮৮২।

৪৮। বিজ্ঞাপন, কথামালা, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ২৯।

৪৯। বিজ্ঞাপন, বোধোদয়, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ১৭৫

৫০। বাক্যকথন—ভাষা, বোধোদয়, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ১৮৬।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।

৫২। শিল্প-বানিজ্য-সমাজ, বোধোদয়, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ২১১।

৫৩। বিজ্ঞাপন, চরিতাবলী, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ৮১।

৫৪। প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, আখ্যানমঞ্জুরী, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ:৩৭৭

৫৫। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রী অশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ৯৫।

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।

৫৯। আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৮৯৮, চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৯৬২, পৃ: ৩-৪।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯।

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২-৬৩।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪-৬৫।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫-৩৬।

৬৭। চতুর্থ উপদেশ — আত্ম উন্নতির উপায়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত, ১ম মুদ্রণ ঃ ১৮১৫ শক—১০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৮৪৬, শক—৫০০, পৃ: ১০৬।

৬৮। দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান, ব্রহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম প্রকাশ, ১ম প্রকরণ ঃ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক, দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ বৈশাখ ১৭৮৮ শক, মাসিক ব্রহ্ম সমাজের উপদেশ, আষাঢ় ১৭৯০ শক, পৃ: ১০৬।

৬৯। অবতরণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৫।

৭০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৪০৩, পৃ: ২৭।

৭১। চোখের বালি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ: ২৪।

৭২। বিজ্ঞাপন, চারুপাঠ — অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৭৭৫ শকাব্দ, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ১-২, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি)।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪-৬৬।

৭৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ডডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৪০৩, পৃ: ২৬।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।

৭৬। বিজ্ঞাপন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৭৭। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—২য় খণ্ড, অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩০, পৃ: ১৪৯, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি)।

৭৮। বিজ্ঞাপন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৭৯। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—২য় খণ্ড, অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩০, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৮০। প্রাগুক্ত।

৮১। বিজ্ঞাপন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৮২। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—২য় খণ্ড, অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩০, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৮৩। প্রাগুক্ত।